ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

ডিসেম্বর ২০১৯ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

নগরায়ণ

ফোকাস

ভারতের বস্তি অঞ্চল : ভ্রান্তধারণা বনাম বাস্তব
অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ

বিশেষ নিবন্ধ

অম্বুতের মাধ্যমে শহরে পরিকাঠামো গঠন
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

গতিশীলতা সহায়ক নগর পরিকল্পনা ও রূপান্তর
অমিতা ভিড়ে

ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ : ক্রেতাদের ক্ষমতায়নে এক নতুন মাইলফলক
শীতল কাপুর

নগরায়ণ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র
অরূপ মিত্র

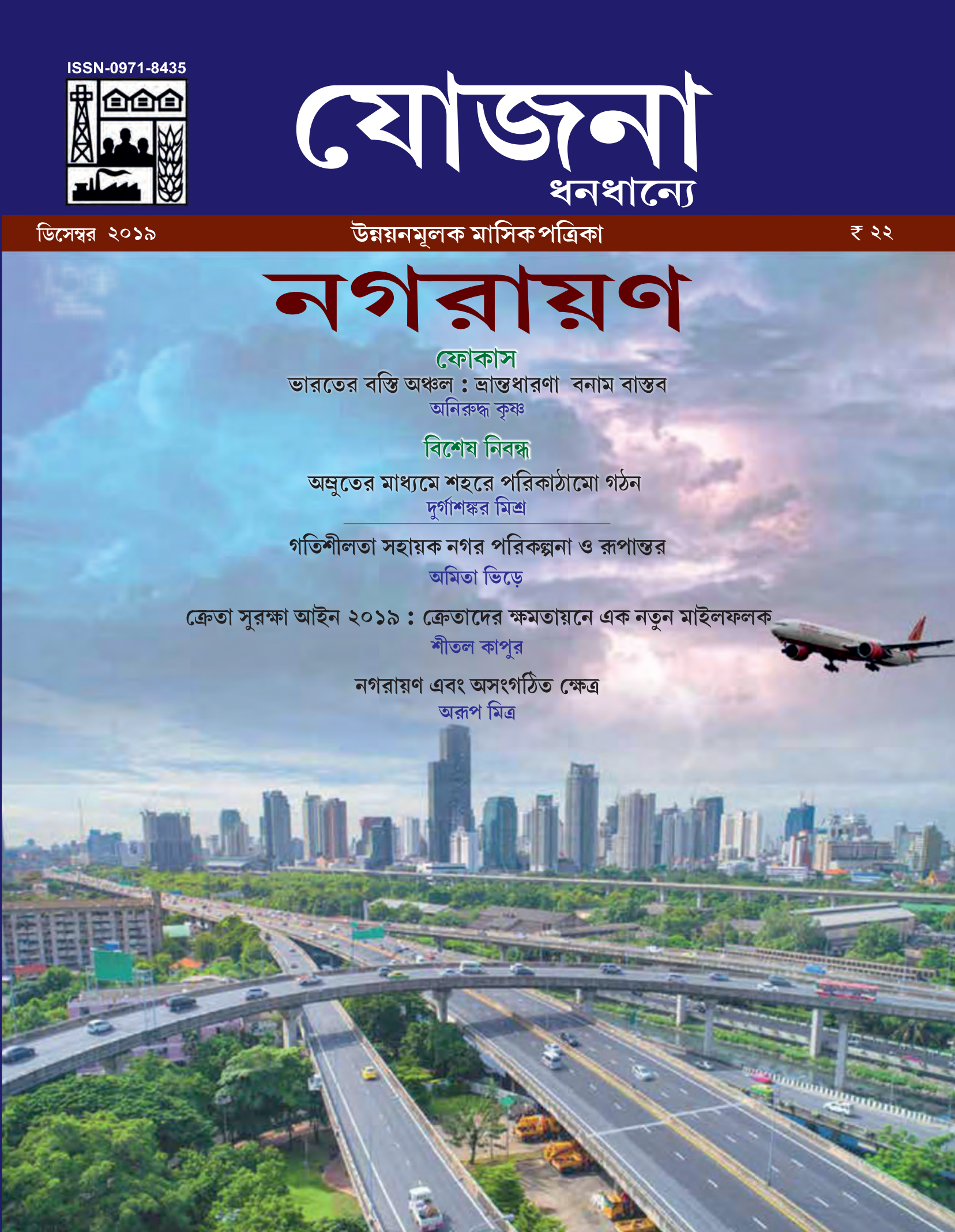

ভারতের মানচিত্র-সহ নবগঠিত (দুই) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মানচিত্র।

সংসদের সুপারিশক্রমে, রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা কার্যকরভাবে বিলোপ করলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন ২০১৯-এ অনুমোদন দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তত্ত্বাবধানে, পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ হিসাবে পুনর্গঠিত হয়েছে।

নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ, কার্গিল ও লেহ্ এই দু'টি জেলাকে নিয়ে গঠিত। পূর্বতন রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের বাকি অংশ নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত।

১৯৪৭-এ, পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ১৪-টি জেলা : কাঠুয়া, জম্মু, উধমপুর, রেয়াসি, অনন্তনাগ, বারামুলা, পুঞ্চ, মীরপুর, মুজফ্ফরাবাদ, লেহ্ ও লাদাখ, গিলগিট, গিলগিট ওয়াজারাৎ, চিলহাস এবং আদিবাসী অঞ্চল (Tribal Territory)।

২০১৯ নাগাদ, সাবেক জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকার এই ১৪-টি জেলার অঞ্চলকে ২৮-টি জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, নতুন জেলাগুলির নাম হল : কুপওয়াড়া, বান্দিপুরা, গান্তেরবাল, শ্রীনগর, বাধগাম, পুলওয়ামা, সোপিয়ান, কুলগাম, রাজৌরী, রামবন, ডোডা, কিস্তওয়ার, সাম্বা ও কার্গিল।

এগুলির মধ্যে লেহ্ ও লাদাখ জেলা থেকে এলাকা বের ক'রে নিয়ে কার্গিল জেলা গঠন করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির জারি করা জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (অসুবিধা দূরীকরণ) দ্বিতীয় আদেশ ২০১৯-এ নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ্ জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্গিল জেলা গঠনের জন্য অঞ্চল বের করে নেওয়ার পর, ১৯৪৭-এর সময়কার লেহ্ ও লাদাখ জেলার বাকি অংশ ছাড়াও, গিলগিট, গিলগিট ওয়াজারাৎ, চিলহাস ও ১৯৪৭-এর আদিবাসী অঞ্চল (Tribal Territory), এই সব জেলার এলাকাগুলি লেহ্ জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এর ভিত্তিতে, ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর তৈরি হওয়া দু'টি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের পরিচয় জ্ঞাপক মানচিত্র Survey General of India প্রস্তুত করেছে। ভারতের নতুন প্রশাসনিক/রাজনৈতিক মানচিত্র এখানে সংযোজিত হল।

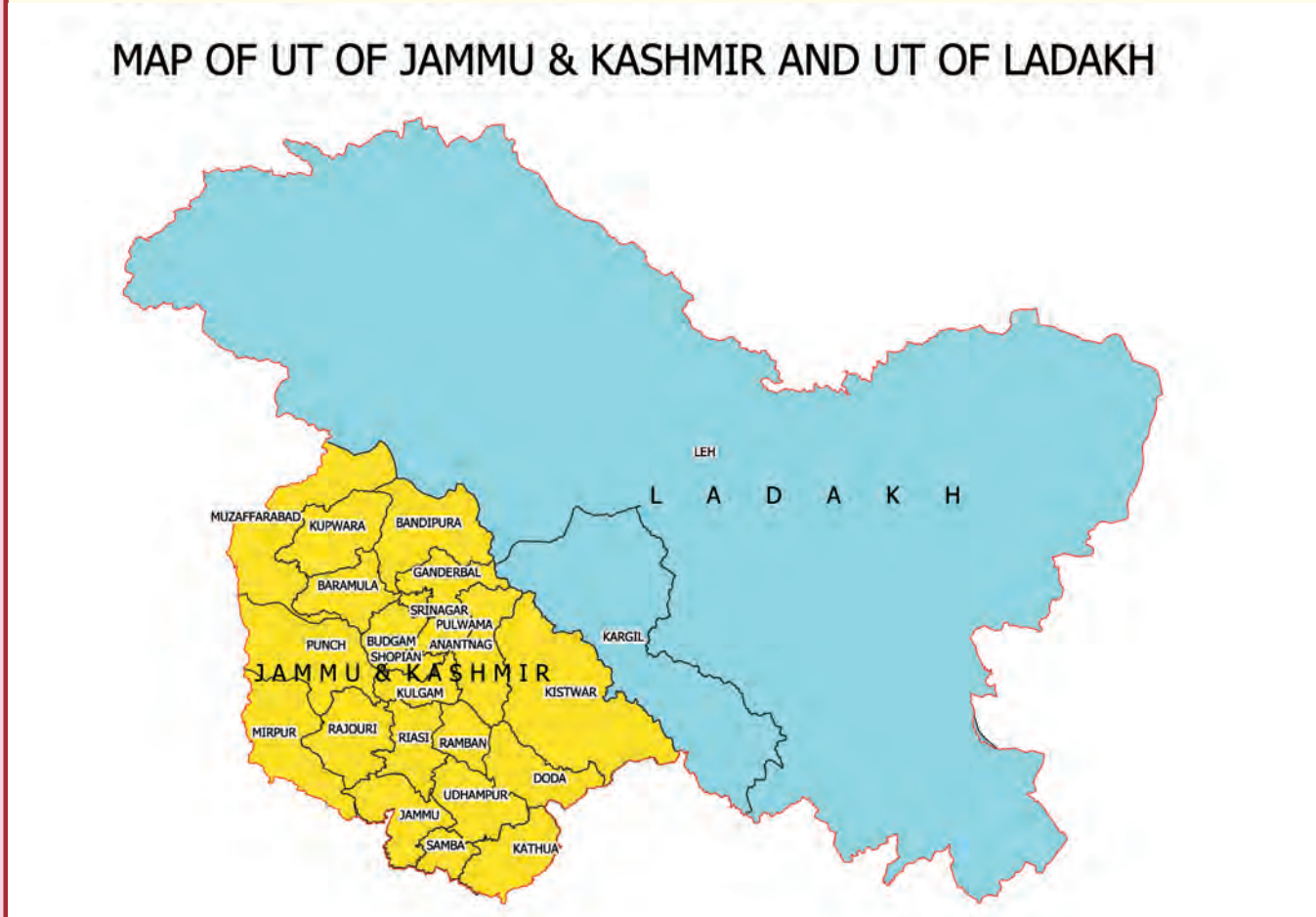

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

(শেষাংশ তৃতীয় প্রচ্ছদে)

ডিসেম্বর, ২০১৯

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র চৌধুরী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- নগরায়ণ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র — অরূপ মিত্র ৫
- গতিশীলতা সহায়ক নগর পরিকল্পনা ও রূপান্তর — অমিতা ভিড়ে ৯
- বনসৃজন : তেলেঙ্গানার ওয়াদারির দৃষ্টান্ত — চন্দ্রশেখর রেড্ডি ১৩
- জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এক নিদারুণ সমস্যা — এস. এস. ছিনা ১৮
- ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ : ক্রেতাদের ক্ষমতায়নে এক নতুন মাইলফলক — শীতল কাপুর ২০
- শহর, শহরতলি অঞ্চল এবং পশ্চাদ্‌ভূমি — ভি. নাথ ২৪

বিশেষ নিবন্ধ

- অম্ভুতের মাধ্যমে শহরে পরিকাঠামো গঠন — দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ২৮

ফোকাস

- ভারতের বস্তি অঞ্চল : ভ্রান্তধারণা বনাম বাস্তব — অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

- উন্নয়নের রূপরেখা — যোজনা ব্যুরো ৪০
- জানেন কি? — —ওই— ৪৪
- আমাদের প্রকাশনা — —ওই— ৪৫
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৬
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪৭
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪৮

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

নগর বনাম নাগরিক : এক অটুট মেলবন্ধন

নগরের পত্তন তার নাগরিকদের হাতে। মানুষজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং সুযোগসুবিধার সূত্র ধরে আড়ে-বহরে ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে নগর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজেদের পছন্দসই জীবনশৈলী উপহার দেয়; উন্নয়নের সোপান বেয়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে তাদের জন্য এক মঞ্চের ব্যবস্থা করে শহর-নগর-মহানগর। কর্মসংস্থানের খোঁজ, মুনাফা কামানো, উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চমানের শিক্ষালাভ, বৃহত্তর বাজারের সন্ধান, তথা এজাতীয় আরও হাজারো সুযোগের সন্ধানের গ্রাম বা মফঃস্বল এলাকা থেকে মানুষ নগরের উদ্দেশে পাড়ি জমায়। কারণ তাদের এলাকায় হয় এসব সুযোগসুবিধার অভাব রয়েছে; এবং ভবিষ্যতেও তা মিলবে এমন আশা সুদূর পরাহত। এধরনের যেসব সুযোগের নাগাল পাওয়ার স্বপ্ন তারা মনের মধ্যে লালন করেন, তার সবক'টি হয়তো উঠতি শহরে মেলে না। তা সত্ত্বেও সেখানেই তারা আস্তানা গেড়ে রয়ে যান; নিজের সন্তানদের উন্নততর ভবিষ্যতে তথা তাদের জন্য সেরা সুযোগের সন্ধানের আশায়।

মানুষ এই যে নিরন্তন ঠাঁই নাড়া হয়ে চলেছে, তার দৌলতেই শহর-নগরের গায়েও চলমানতার ছাপ পড়ে। গ্রাম থেকে আধা-শহর থেকে শহরাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল থেকে মহানগর; এ যেন এক নিরন্তর চক্র। গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকা শহর/নগরকে পরিষেবা জোগায় ঠিক সেভাবে, যেমন কিনা নদীকে পুষ্ট করে তার উপনদীসমূহ। কাছেপিঠে থেকে দূরদূরান্ত, জনস্রোত এসে থিতু হয় শহর বা নগরে; এবং কালক্রমে তারাই নগরায়ণের অংশ হয়ে ওঠে। সেই সূত্রেই সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়, ব্যক্তি মানুষের জন্য তো বটেই; সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠীর জন্যও। সীমিত সহায়সম্পদ এবং বর্তমান পরিকাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপের কারণেই বিনিয়োগ এখন সময়ের দাবি। এর ফলে আরও বেশি বেশি করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হবে; এবং কালে কালে সেই সূত্রে আরও প্রচুর মানুষ শহর-নগরে এসে থিতু হবেন।

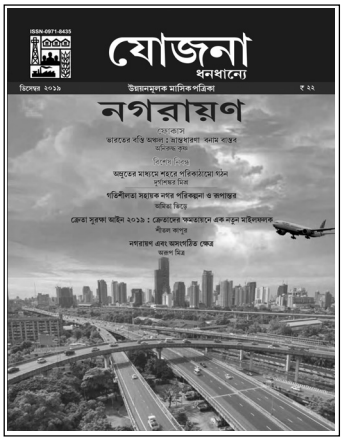

এভাবেই শহর আড়ে-বহরে প্রশস্ত হয়ে চলে; কিন্তু কিন্তু তার তো একটা সীমা আছে। যে শহর উপকূলীয় অঞ্চলের যত কাছাকাছি অবস্থিত, তার ক্ষেত্রে প্রসারণের সম্ভাবনা ততই সীমিত। এছাড়াও, গ্রামীণ পশ্চাদভূমি এলাকায় হাত-পা ছড়িয়ে শহরের এইভাবে বিস্তারের সূত্রে ফায়দা ও লোকসান বা সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। এই সীমিত বিকল্পের সম্ভার নিয়ে, ব্যাঙের ছাতায় মতো বেড়ে চলা জনসংখ্যার নিরন্তর চাহিদা স্থায়ী ভিত্তিতে মেটানো শহরগুলির সামনে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাথে রয়েছে নয়া ভারতের স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে বৃদ্ধি কেন্দ্রের শর্ত পালনের গুরুদায়িত্ব।

বিগত কয়েক বছরে, দেশের অধিকাংশ মহানগর তাদের নিজস্ব সহায়সম্পদের সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আকাশছোঁয়া জমির দামের কারণে গগনচুম্বী সব অট্টালিকা গড়ে উঠছে যত্রতত্র। এর দৌলতে শহরগুলি হয়ে উঠেছে আরও বেশি বিপর্যয় প্রবণ। একটি শহর তখনই সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে যদি তার আশপাশের গ্রাম বর্ধিষ্ণুভাবে টিঁকে থাকে এবং এর উলটো কথাটাও সঠিক। কাজেই গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকাতে উচ্চমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। যাতে করে সেই সব এলাকা থেকে শহর অভিমুখে অপ্রয়োজনে জনস্রোতের উপর রাশ টানা যায়।

শহরের উপরও লাগোয়া গ্রামীণ এলাকাগুলির পরিষেবা জোগান কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব বর্তায়। এখানে ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত 'যোজনা' পত্রিকার সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে; এত বছর পর, আজকের দিনেও যা কিনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সেখানে বলা হয়েছিল, ''মানুষকে শহর থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নগরায়ণের চেহারা কদর্য হয়ে ওঠা ঠেকানো যাবে না; কিন্তু তা সম্ভব, যেখানে ইতোমধ্যেই মানুষের বসতি রয়েছে, শহরের সুযোগসুবিধা সেখানে পৌঁছে দিয়ে''। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বজায় রেখে গ্রাম ও নগর ভারত যাতে সুষ্ঠু দিশায় বিকশিত হতে পারে তার জন্য এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হবে।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এই ফাঁক বোঁজাতে বিবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একদিকে, পরিকাঠামোগত বিকাশ ঘটিয়ে ভৌত অগ্রগতির বন্দোবস্ত; অন্যদিকে, সামাজিক পার্থক্য ঘোচাতে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমান সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। উপগ্রহ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনায় প্রযুক্তি ব্যাপক সাহায্য করেছে এবং বর্তমান সড়ক নেটওয়ার্ককে যানজট মুক্ত ক্ষেত্রেও। ভাবনাটা হল, শহর-নগরগুলির উপর থেকে অস্বাভাবিক বোঝা হাটানো। তারপর সেখানে বিশ্বমানের পরিকাঠামো, সুযোগসুবিধা গড়ে তুলে নাগরিকদের জীবনযাপনকে সুখকর করে তোলা। বিত্তবান শ্রেণির জন্য বিলাসবহুল আবাসন সোসাইটি, সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধাযুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল, মহার্ঘ বিপণী এখনও রয়েছে। যেটা দরকার, তা হল প্রান্তিক গোত্রের নগরবাসীদের জন্যও একই ধরনের সরকারি সুবিধাপত্রের সংস্থান। পাশাপাশি, গ্রামাঞ্চলের জন্য মানুষের সাধ্যের মধ্যে উচ্চ গুণমানের পরিষেবার বন্দোবস্ত। তা হলেই, ইতিবাচক অর্থে বিপরীত মুখে পরিযান ঘটবে।

নগর পরিকল্পনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজকর্মের দৃষ্টান্ত রেখেছেন নানা ক্ষেত্রের এমন বেশকিছু বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তুলে ধরা হল যোজনার এই সংখ্যায়। নগর ভারতের ভোলবদলের মূল চাবিকাঠিগুলি নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। রূপান্তর পর্বে সম্ভাব্য যেসব ফাঁকফোকর রয়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেসবের প্রতি। জটিল সমস্যাগুলির বাস্তব সমাধানের পথ বাতলেছেন। যেমনটি তারা বলেছেন, প্রথমে আমরা অট্টালিকা গড়ি, শহরের রূপরেখাকে আকার দিই; তারপর শহরই আমাদের গড়েপিটে নেয়।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নগরায়ণ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র

অরূপ মিত্র

মানুষের সার্বিক কল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আজ বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের, যেখানে মজুরি নিয়ে দরাদরির সুযোগ শ্রমিকের কাছে অনেক কম। ফলে মানবকল্যাণের বিষয়টি ধাক্কা খায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রশ্নেও বেশ খামতি থাকে। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে জীবিকার অপর্যাপ্ত সংস্থানের ফলে শহর এলাকার অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করাটাও হতদরিদ্র মানুষের কাছে শ্রেয় বোধ হয়। এই প্রবণতা নগরায়ণের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ সমস্যাজনক।

শহর ও গ্রামজীবন এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর অভিবাসন (migration)-এর প্রভাব এই নিবন্ধের আলোচ্য। কাজের সুযোগ ও পরিবেশ, সামাজিক প্রশ্নে অনগ্রসর গোষ্ঠীর অবস্থা এবং অভিবাসনের পারস্পরিক সংযোগের দিকটি ধরতে চাওয়া হয়েছে এই লেখায়।

মানুষের সার্বিক কল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আজ বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের, যেখানে মজুরি নিয়ে দরাদরির সুযোগ শ্রমিকের কাছে অনেক কম। ফলে মানবকল্যাণের বিষয়টি ধাক্কা খায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রশ্নেও বেশ খামতি থাকে। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে জীবিকার অপর্যাপ্ত সংস্থানের ফলে শহর এলাকার অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করাটাও হতদরিদ্র মানুষের কাছে শ্রেয় বোধ হয়। এই প্রবণতা নগরায়ণের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ সমস্যাজনক। ভারতে গ্রাম থেকে মফস্বলে যাওয়ার ঝোঁক কম হলেও গ্রাম থেকে বড়ো নগরগুলিতে যাওয়ার ঝোঁক খুব বেশি। ফলে দ্রুতগতিতে বাড়ছে নগরগুলির জনসংখ্যা, বিশাল সংখ্যক মানুষ কাজের জন্য যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। থাকছেন শহরের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে।

আজকের ভারতীয় নগরাঞ্চল দক্ষ কর্মীদের সামনে প্রচুর সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলে আসা নগরজীবনের নানান নেতিবাচক প্রবণতার হাত থেকে রেহাই মেলার সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না এখনও।

অভিবাসন এবং সম্ভাবনা

গ্রামে সাক্ষরতা এবং শিক্ষার প্রসার পল্লী অঞ্চল থেকে শহরে অভিবাসনের হার বাড়ায়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রশ্নে অবহেলিত মানুষজনও তুলনামূলকভাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশায় শহরের দিকে ঝোঁকেন। তবে, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে, অভিবাসন গ্রাম এবং শহর দু'টি অঞ্চলেই দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেকটা সহায়ক হয়ে ওঠে। সোজা কথায়, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ শহরে গিয়ে কিছু না কিছু কাজের সুযোগ করে নিতে পারেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে

নগরায়ণের প্রসার এবং গ্রাম ও শহরের মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে অভিবাসন বা migration-এর সম্পর্ক ধনাত্মক (positive)। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অভিবাসনের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বেশি। অভিবাসনের পর তাদের কাজে নিযুক্ত অবস্থায় থেকে যাওয়াটাই প্রত্যাশিত।

[লেখক নতুন দিল্লির সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ-এর প্রফেসর (অধ্যাপক)। ই-মেল : arup@iegindia.org]

ওঠে যে, কম উৎপাদনশীলতা সত্ত্বেও শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজের বাজার গ্রামের তুলনায় ভালো (মিত্র, ২০১৯)।

নগরায়ণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি অভিবাসনের সঙ্গে সরাসরি ধনাত্মকভাবে জড়িত। যেসব রাজ্যে নগরায়ণ-এর হার বেশি সেখানে এই প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই আরও জোরদার।

অভিবাসন, শহরাঞ্চলের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষজনের গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া, এইসব বিষয়গুলির একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ধনাত্মক। বিষয়টি দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমায়। গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। নগরায়ণ বা অন্য যেকোনও প্রক্রিয়ায় এদের অন্যত্র নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কলেবর এবং নগরায়ণের মধ্যেকার সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্র বহু মানুষের জীবিকার উৎস। বস্তুত, দ্রুত নগরায়ণ গ্রামের ভোলবদলকেও ত্বরান্বিত করে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের বাণিজ্য বা পরিষেবার মান তলানিতে থাকে, তবে অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্র বড়ো মাপের শিল্পায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমনটাই বলা হ'ত আগেকার অনেক লেখায় (Udall, 1976)। কিন্তু, বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে উৎপাদন, বাণিজ্য এবং পরিষেবা, এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাছাড়া, তুলনামূলকভাবে অগ্রসর রাজ্যগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত এটাই প্রমাণ করে যে আর্থিক বৃদ্ধি উৎপাদন, বাণিজ্য এবং পরিষেবা, তিনটি বিষয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে। মাথাপিছু আয় এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটলে উৎপাদন ও বাণিজ্যও প্রসারিত হয় আপনা থেকেই। মাথাপিছু আয় বাড়লে নতুন ধরনের পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই পরিষেবা মিলতে পারে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকেও (Rakshit, 2007)।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিল্পসংস্থাগুলির একটা বড়ো অংশে ভাড়া করা শ্রমিক ছাড়াই চলে (Own Account Enterprise—OAE)। কিন্তু, সাধারণভাবে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মসংস্থানের বড়ো উৎস এই ক্ষেত্র। এর মধ্যে আবার উৎপাদন সংস্থাগুলিতে বাণিজ্য কিংবা পরিষেবা সংস্থার চেয়ে বেশি মানুষ কাজ করেন।

শহরাঞ্চলে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা কিন্তু সাধারণভাবে বেশি। আবার গ্রামাঞ্চলে ভাড়া করা শ্রমিক ছাড়া চলা সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতা অন্য সংস্থার তুলনায় কম। এর মধ্যে আবার বাণিজ্য ও পরিষেবা উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনশীলতা বেশি। শহরাঞ্চলেও ভাড়া করা শ্রমিকবিহীন উদ্যোগগুলির উৎপাদনশীলতা কম। এর

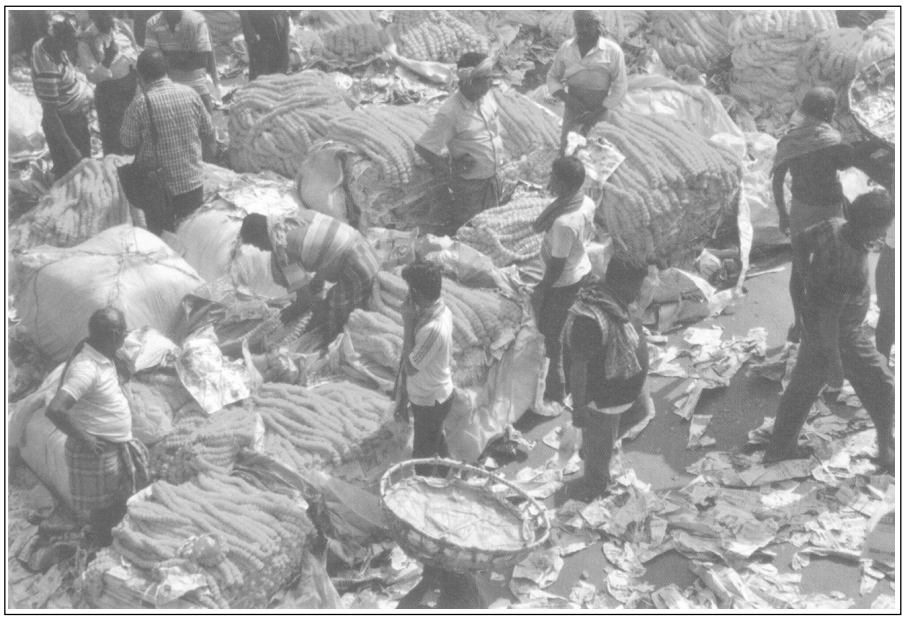

বাসিন্দাদের ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো এই পুর কর্তৃপক্ষবিহীন শহুরে জনপদগুলির আছে কি? এইসব এলাকায় সম্পদ আহরণ হতেই পারে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অপরিকল্পিত পন্থায়। বসবাস কিংবা অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত পরিকাঠামো এইসব জনপদে পর্যাপ্ত নয় মোটেই।

*খুব বড়ো শহরগুলি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার কারণে নতুন যেসব শহুরে জনপদ তৈরি হচ্ছে সেগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত শহর (**second rank cities**)-এর যথার্থ পরিবর্ত হয়ে উঠতে পারে কি? তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, বড়ো শহরে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ নিঃশেষিত হলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত শহরগুলি। আনকোরা নতুন শহুরে জনপদের তুলনায় সেখানে পরিকাঠামোও অনেক উন্নত। তবে, এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত শহরগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি করে তুলতে হলে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে এধরনের সুনির্দিষ্ট সমন্বয় পরিকল্পনা এখনও চোখে পড়ছে না।*

মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলির উৎপাদনশীলতা বেশি। উৎপাদনশীলতার প্রশ্নে এর পরেই রয়েছে পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলি। কাজেই আগেকার লেখায় বাণিজ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলিকে কম উৎপাদনশীল বলা হলেও এখন আদপে তা খাটছে না।

নগর ভারতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বহু সংখ্যক শহুরে জনপদ গড়ে ওঠা যেখানে পুর কর্তৃপক্ষ নেই (census towns)।

নগরাঞ্চলকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়, বিধিবদ্ধ শহর (statutory town), পুর কর্তৃপক্ষবিহীন শহুরে এলাকা (census town) এবং শহরের পাশে গড়ে ওঠা কলোনি বা জনপদ (outgrowth)। পুর কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পর্ষদ বা প্রজ্ঞাপিত সমিতি সম্বলিত বড়ো জনপদকে বলা হয় বিধিবদ্ধ শহর। অন্যদিকে census town হল সেইসব এলাকা যেখানে : (ক) ন্যূনতম জনসংখ্যা ৫,০০০, (খ) পুরুষ কর্মীদের অন্তত ৭৫ শতাংশের পেশা কৃষি ছাড়া অন্য কিছু, (গ) জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত চার হাজার। প্রাতিষ্ঠানিক পুর কর্তৃপক্ষ না থাকলেও দ্রুত নগরায়ণের ফলে এইসব এলাকায় শহুরে ছাপ থাকে অনেকটাই। ২০১১-র জনগণনায় দেখা গেছে আগের দশকে (২০০১-'১১), গড়ে উঠেছে ২,৫০০-রও বেশি census town। অন্যদিকে, স্বাধীনতার পর প্রায় ষাট বছরে গড়ে উঠেছে এধরনের ১,৩৬২-টি জনপদ।

এধরনের জনপদগুলির অবস্থানগত চরিত্রটি খতিয়ে দেখা যাক এবার। তারা কি খুব বড়ো শহরগুলির আশপাশে গড়ে

উঠেছে? তা হলে বলা যেত পারে যে, শহরে স্থান সঙ্কুলানের অভাব হওয়াতে অথচ শ্রমের চাহিদা থাকতে এমনটা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, পুর কর্তৃপক্ষবিহীন শহুরে জনপদগুলি বেশি রয়েছে কেরল, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে।[১] এর মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। কেরলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হল আবাদক্ষেত্র (plantation sector)। উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের হার মাঝারি হওয়া সত্ত্বেও গড়ে উঠেছে অনেক নতুন শহর। এক্ষেত্রে ওই রাজ্যের আয়তন এবং জনসংখ্যারও ভূমিকা থাকতে পারে।

সাধারণভাবে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিধিবদ্ধ শহর এবং পুর কর্তৃপক্ষবর্জিত শহুরে জনপদের সংখ্যার মধ্যে সম্পর্কটি ধনাত্মক। অর্থাৎ বিধিবদ্ধ শহরগুলি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার ফলে জনসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে বাড়তি চাহিদার জন্যই ক্রমে হতে থাকে নগরায়ণ। ভগৎ (২০১১) দেখিয়েছেন যে, ২০০১-২১১ দশকে নগরায়ণের হার ছিল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। তার লেখায় বলা হয়েছে স্বাধীনতার পর ওই সময়েই প্রথম শহরে বসবাসরত মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলের মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়। ২০০১ সালে অনথিবদ্ধ ১,৩৬২-টি শহুরে জনপদের বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ। ২০১১-এ সংখ্যা দু'টি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৮৬২ এবং ৫ কোটি ৮৬ লক্ষে। অনথিবদ্ধ শহুরে অঞ্চলগুলির জনসংখ্যায় এই ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ বৃদ্ধি আলোচ্য দশকে সামগ্রিকভাবে এদেশের শহরে বসবাসরত মানুষের মোট সংখ্যা বৃদ্ধির ৪১ শতাংশ।

অনথিবদ্ধ শহুরে জনপদগুলিতে উন্নত নাগরিক পরিষেবা অমিল তো বটেই অভিবাসনের ফলে এসে পড়া বিপুল সংখ্যক মানুষের স্থান সঙ্কুলানের জায়গাও সেখানে পর্যাপ্ত নেই। যতটা সুযোগ রয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ কাজের খোঁজে এসে থাকে এইসব এলাকায়। বাড়তি এইসব মানুষ বাধ্য হন কম উৎপাদনশীল কাজ করতে। তার মানে কি এই যে, বস্তি সমস্যা ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর আকার নিতে চলেছে? বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও বাড়তি লোকের এই চাপ আছে। কিন্তু সেখানে তা সামাল দেওয়ার ব্যবস্থাপনাও তুলনামূলক-ভাবে অনেক জোরদার। তাছাড়া বড়ো শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতদের প্রকৃত আয়ও তুলনায় বেশি।

শহরের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে জমির ব্যবহারের পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনথিবদ্ধ শহুরে জনপদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। শহরের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষিজমি অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তবে গড়ে ওটে আধা-শহুরে অঞ্চল। এই প্রবণতা পরবর্তী পর্বে খাদ্য নিরাপত্তার সামনে বড়ো প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে। আধা-শহুরে জনপদে শ্রমের জোগান এবং চাহিদার ভারসাম্য না থাকাও বিরাট একটা সমস্যা। এসবের মোকাবিলায় অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) নতুন পুরসভাবিহীন শহুরে জনপদগুলির ২০.৭৪ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে, ১৪.৩ শতাংশ কেরলে, ১০.৪৭ শতাংশ তামিলনাড়ুতে, ৭.৯৪ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে, ৬.২৪ শতাংশ মহারাষ্ট্রে এবং ৫.৩৩ শতাংশ অন্ধ্রপ্রদেশে।

তথ্যপঞ্জি :

(১) Bhagat, (2011), "Emerging Pattern of Urbanisation in India", Economic and Political Weekly, August 20, Vol. XLVI, No. 34.

(২) Mitra, Arup (2019), Rural to Urban Migration and Urban Labour Market (Chapter-7) in Cities of Dragons and Elephants : Urbanization and Urban Development in China and India, Ed. by Guanghua Wan and Ming Lu, Published by Oxford University Press (UK).

(৩) Rakshit, M. (2007). Services-led growth: The Indian experience, Money and Finance, 3, 91-126.

(৪) Udall, A. T. (l976). The effects of rapid increases in labour supply of on service employment in developing countries, Economic Development and Cultural Changes, 24(4), 765-785.

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

পরিবেশ

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গতিশীলতা সহায়ক নগর পরিকল্পনা ও রূপান্তর

অমিতা ভিড়ে

গতিশীলতা ক্রমশ বেশি করে আধা বা অস্থায়ী হচ্ছে। কিছুদিন বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করে আবার নিজের ভিটেয় ফিরে আসা এবং এর বেশিরভাগটা কাছেপিঠে হলেও, দূরদূরান্তে এবং ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার দৃষ্টান্তও গুচ্ছের। গতিশীলতার এই পরিবর্তন শহরাঞ্চলের সরকারি নীতির সঙ্গে খাপসই নয়। তা সেই শহর ছোটো বা বড়ো যাই হোক না কেন। অভিবাসীদের উপস্থিতি এবং অবদান বদলে দিচ্ছে শহরের ভোল। এই নিবন্ধে বিশেষভাবে আবাসন নীতি এবং তা কিভাবে অভিবাসীদের আগমন ও তাদের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ সেদিকে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে।

অভিবাসনের ব্যাপারে এক অগ্র সক্রিয় কর্মকৌশল নগরাঞ্চলের অর্থনীতি এবং প্রাণোচ্ছলতায় বিশেষ কাজে লাগতে পারে। ভারতে গত দশকটিতে গতিশীলতার বিভিন্ন ফর্মে যথেষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। আগে অভিবাসন বলতে বোঝাত জন্মস্থান থেকে বসতি অন্যত্র বা গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে ভিন শহরে সরানো। এখন গতিশীলতা আর অভিবাসনের সেই ধরাবাঁধা গতে আটকে নেই।

গতিশীলতা ক্রমশ বেশি করে আধা বা অস্থায়ী হচ্ছে। কিছুদিন বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করে আবার নিজের ভিটেয় ফিরে আসা এবং এর বেশিরভাগটা কাছেপিঠে হলেও, দূরদূরান্তে এবং ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার দৃষ্টান্তও গুচ্ছের। গতিশীলতার এই পরিবর্তন শহরাঞ্চলের সরকারি নীতির সঙ্গে খাপসই নয়। তা সেই শহর ছোটো বা বড়ো যাই হোক না কেন। অভিবাসীদের উপস্থিতি এবং অবদান বদলে দিচ্ছে শহরের ভোল। এই নিবন্ধে বিশেষভাবে আবাসন নীতি এবং তা কিভাবে অভিবাসীদের আগমন ও তাদের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ সেদিকে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। সরকারি নীতির এই খামতির দরুন অভিবাসীরা বাধ্য হয় প্রথাগত ব্যবস্থার বাইরে

গতিশীলতায় সাড়া দেওয়ার পদক্ষেপ রূপে খবরাখবর দিতে হায়দরাবাদ মেট্রো ব্যবহার করে চারটি ভাষা।

[লেখক অধ্যাপক ও ডিন, স্কুল অব হ্যাবিট্যাট স্টাডিজ, টাটা ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস, মুম্বাই। ই-মেল : amita@tiss.edu]

মুম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের বাইরে রাস্তাঘাটে ক্যানসার রুগিদের মাথাগোঁজা।

গিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে। এই ছাঁদ তৈরি করে এক দুষ্টচক্র। তার ফাঁদে পা দেয় শহর এবং অভিবাসী দু'তরফই। প্রবাসীদের ইস্যুগুলি জানা এবং তাতে সাড়া দিতে পুর সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়সম্পদ ও ক্ষমতা দেওয়াটা জরুরি।

মুখপাত

সেনসাসের হিসেব, অভিবাসীর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ। ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-সহ বেশকিছু অনুসন্ধানের মতে এই অঙ্ক যথেষ্ট কম। অভিবাসনের সংখ্যা কমানোটা উদ্বেগের বিষয়, কেননা এর দরুন নীতির প্রতি হেলাফেলা আসতে পারে (চন্দ্রশেখর এবং দোরে, ২০১৪)। অভিবাসীদের আবাসন ও কার্যকলাপের দরুন বদলে যাওয়া স্থানগুলি হচ্ছে এসম্পর্কিত দ্বিতীয় উদ্বেগ। নিবন্ধটি দৃষ্টি দিয়েছে এই উদ্বেগের দিকেই। নগরের আদি বাসিন্দারা ঘর ছাড়বে না এই ধারণা এবং দীর্ঘকাল বসবাসের সঙ্গে নাগরিকত্বের সংযোগ এখনকার অস্থায়ী অভিবাসন ধাঁচের সঙ্গে খাপ খায় না। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য যে স্তরেই নেওয়া হোক না কেন অধিকাংশ নগর নীতিই গতিশীলতার এই নতুন দিকগুলিকে আমল দেয়নি। সত্যি কথা বলতে, অভিবাসীদের জন্য নেওয়া বিশেষ নীতিগুলিতেও শহরের আদি বাসিন্দাদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব কাজ করে। অধিকাংশ অভিবাসী বাধ্য হয়ে উপায় খোঁজে আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত ব্যবস্থার বাইরে। মাথাগোঁজা, মৌল পরিষেবা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে এহেন সমাধান অভিবাসীদের জীবনযাপনে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে।

"সরকারি নীতিতে খামতি থাকায় অভিবাসীরা প্রথাগত ব্যবস্থার চৌহদ্দি টপকে সমাধানের পথ খোঁজে। এই প্রবণতার দরুন সৃষ্ট দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়ে শহর এবং অভিবাসী উভয়েই। আশ্রয়, প্রাথমিক পরিষেবা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে এহেন সমাধান অভিবাসীদের জীবনযাত্রায় হ্যাপা আনে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল যে এরকম অধিকাংশ সমাধান পুর প্রশাসনের সামনে খাড়া করে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ।"

শুধু কি তাই, পুর প্রশাসনের সামনেও খাড়া হয় নতুন সব চ্যালেঞ্জ।

এই নিবন্ধ শহর রূপান্তরের এক বড়ো অঙ্গ হিসেবে গতিশীলতার পক্ষে সাড়া দেওয়া, স্থানীয় পুর প্রশাসনচালিত নীতি পরিবেশের জন্য সওয়াল করেছে।

ভারতে গতিশীলতার মাত্রা ও ধাঁচ বদল

বিগত দশকটিতে ভারতে গতিশীলতার মাত্রা এবং ধাঁচ বা আকার অনেক বেড়েছে। বেড়েছে এসব নিয়ে চর্চার রেওয়াজও। অভিবাসনের ব্যাপারস্যাপার বুঝতে প্রচলিত পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে সেনসাস বা জনগণনার সংজ্ঞা এবং তার কারণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রচেষ্টা। জনগণনার সংজ্ঞা অনুযায়ী, আগেকার সুমারিতে তালিকাভুক্ত বাসস্থান থেকে কেউ অন্যত্র বাসা বদল করলে বা জন্মস্থান থেকে সরে গেলে সে হন অভিবাসী। এই সংজ্ঞা মাফিক দেশে অভিবাসী প্রায় ৪৫ কোটি ৩৬ লক্ষ। এর মধ্যে ৬৪ শতাংশ ১০ বছর আগে বর্তমান আবাসস্থলে এসেছে। এটা অবশ্য ভারতে অভিবাসনের এক খণ্ডচিত্র মাত্র। সম্প্রতি, বেশকিছু পণ্ডিত এবং মায় ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষার মতেও জনগণনা এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে অভিবাসীর সংখ্যা ঢের কমিয়ে দেখানো হয়েছে এবং এই দু'টি সরকারি তথ্যেই অস্থায়ী অভিবাসনকে অবহেলা করার প্রবণতা আছে। দেশিঙ্কর ও আকতার (২০০৯)-সহ এরকম কিছু সমীক্ষা অনুযায়ী, ক্ষেত্রগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অভিবাসীর সংখ্যা ১০ কোটিখানেক। চন্দ্রশেখর ও শর্মা (২০১৪) আবার হিসেব করেছেন যে ২০০৯-২১০ সালে শহরে অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি এবং তুম্বে (২০১৬) বলেন গ্রামের প্রায় ২০ শতাংশ পরিবার অন্তত একবার দেশের মধ্যে স্থানান্তরে গেছে। দেশিঙ্কর এবং অন্যান্যদের মত, ১০ কোটিখানেক অভিবাসীর সংখ্যা আরও কিছু হিসেবে মিলেছে। উল্লেখ করতে হবে যে ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৬-'১৭)-র তথ্য,

আন্তঃরাজ্য অভিবাসী ৬ কোটি এবং আন্তঃজেলা অভিবাসী ৮ কোটি। এটা মেনে নেওয়া দরকার যে ভারতে গতিশীলতা যথেষ্ট বাড়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং এই গতিশীলতার রকমসকম বিবিধ। দু'টি ধরন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (ক) রোজকার অভিবাসী এবং (খ) অস্থায়ী অভিবাসী। শহর গড়েপিটে নিতে এ দুই ধরনের গতিশীলতার তাৎপর্য আছে।

গতিশীলতা কিভাবে স্থানকে পালটে ফেলে

নাইক ও র‍্যানডলফ (২০১৮) জোরাল দাবি করেন যে, অভিবাসনের মাধ্যমে স্থানের রূপান্তরের দিকে নজর দেওয়া দরকার। ব্যাপক অভিবাসনের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে স্থানের ক্ষেত্রে। স্থায়ী অভিবাসন মাপার প্রথাগত তথ্য এই তাৎপর্যের হিসেব কষবে পরিকাঠামো এবং আবাসনগত বোঝার প্রেক্ষিতে। তবে অল্পদিনের অভিবাসন নির্দিষ্ট ধরন এবং আকৃতির পরিকাঠামো বা আবাসনের দিকে গুরুত্ব দিতে আমাদের বাধ্য করে। অস্থায়ী অভিবাসীরা শহরের অর্থনীতিতে অবদান রাখে যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে। কিন্তু তারা যেখান থেকে আসে সেখানকার অর্থনীতিতেও তাদের কাজকর্মের প্রভাব পড়ে। নিজেদের স্থায়ী মুলুকে টাকাকড়ি পাঠানো, লগ্নি, সম্পদ তৈরি এবং সরকারি রাজস্বে তাদের অবদান থাকে। অন্যদিকে, তারা শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উৎপাদনে অবদান রাখে, শহরের সহায়সম্পদে কম ভাগ বসায় এবং কাজ করার নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও পথ নিয়ে আসে।

কাজ এবং অর্থনৈতিক কারণ এই ধরনের অভিবাসনের মূল হলেও, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুযোগের খোঁজও আর এক হেতু পারে। এর দরুন শহরের পরিকাঠামো এবং পরিষেবায় চাহিদা বাড়ে। এছাড়া, এহেন চাহিদা বিশেষ স্থানে বেশি। যেমন, হাসপাতাল অনেক রুগি টানে এবং তাই হাসপাতালের কাছেপিঠের এলাকা এবং অভিবাসীর (রুগি ও পরিচর্যাকারীর) থাকার এক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। কলেজের আশপাশও এমন কেন্দ্র হয়ে যায়। নির্মাণ এবং রিসাইক্লিংয়ের মতো অভিবাসী-নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এলাকাও এধরনের কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। পরিবহণের মতো পরিষেবা পরিকাঠামোর চাহিদা বাড়ে। বহু দূর থেকে যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা, কাজের জায়গায় সস্তায় পুষ্টিকর খাবার মেলা এবং তার ধারে কাছে আস্তানার চাহিদা তৈরি হয়। অভিবাসীদের চেনাজানা ভাষায় লেখাপড়ার জন্য স্কুল দরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পরিষেবা সংস্থায় অভিবাসীদের জানা ভাষায় কথাবার্তা চালানোর কর্মী থাকাও চাই।

> *"কাজ ও অর্থনৈতিক কারণ এই ধরনের অভিবাসনের দিকে ঠেলে দেয়, তবে সেইসঙ্গে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ খোঁজাও আর এক হেতু। অভিবাসনে অগ্রসক্রিয় কর্মকৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গি শহরের অর্থনীতি ও প্রাণোচ্ছলতায় যথেষ্ট উপকার করতে পারে, কেননা তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উৎপাদনে অবদান রাখে। শহরের সম্পদে কম ভাগ বসায় এবং কাজ করার নতুন নতুন ধ্যানধারণা ও উপায় নিয়ে আসে।*

> *"হোটেলে থাকার চেয়ে বেশি এবং ঘর ভাড়া করে থাকার চেয়ে কম দিনের অবস্থানের চাহিদা সবচেয়ে অবহেলিত। আবাসন বাজার এই চাহিদা বুঝতে শুরু করেছে এবং সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টের মাধ্যমে তা পূরণ করছে। কম উপায়ী লোকজনের কাছে অবশ্য এ সুযোগ পুরোপুরি অধরা। আগে শহরে ধর্মশালা ছিল।"*

এসব প্রয়োজনের দিকে অবহেলা অভিবাসীদের ঠেলে দেবে আপাতত কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো বন্দোবস্ত করে নিয়ে। রাস্তার মোড়ে গজিয়ে উঠবে আড্ডাখানা। সেখানে থাকবে চা-খাবার দোকান, একটু জিরিয়ে নেওয়ার জায়গা। ফুটপাত এবং রাস্তা দখল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, হাসপাতালের কাছাকাছি রাস্তায় গড়ে ওঠে রুগি ও তার সঙ্গের লোকজনের থাকার ঠেক। বহিরাগত পড়ুয়াদের জন্য কলেজের আশপাশে জেঁকে উঠবে ঘর ভাড়ার ব্যবসা এবং ফাস্ট ফুডের দোকানপাট। রিসাইক্লিং কারখানার চারদিক জুড়ে অস্থায়ী ঝুপড়ি। শৌচাগার না থাকায়, রাস্তাঘাটেই মলমূত্র ত্যাগ। পথের ধারে জঞ্জালের ডাঁই। বস্তি গড়ে উঠবে কাতারে কাতারে। পক্ষান্তরে, অভিবাসনের ব্যাপারে অগ্রসক্রিয় কর্মকৌশল থাকলে শহরের অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত হবে। শহর হবে প্রাণোচ্ছল। হায়দরাবাদ মেট্রোতে চারটি ভাষায় খবরাখবর জানানোটা এক ভালো দৃষ্টান্ত।

নগর নীতিতে অভিবাসীদের সাহায্য করার জন্য দূরদর্শিতা চাই : স্বল্পকালীন আবাসন

ভারতের শহরগুলিতে স্বল্পকালীন আবাসন হচ্ছে অভিবাসীদের সবচেয়ে গুরুতর এবং অপূর্ণ চাহিদা। ঘর ভাড়ার চাহিদা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অস্থায়ী আবাসনের দরকার বেশ কয়েক মাস অবধি হতে পারে। শহরে কিছুদিনের জন্য আগত অভিবাসীদের মধ্যে সেইসব গোষ্ঠী পড়ে, যারা শহরকে ব্যবহার করে সম্পদ হিসেবে। হোটেলের চেয়ে বেশি এবং ঘর ভাড়া করে থাকার চেয়ে কম দিন অবস্থানের দরকার সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আবাসন বাজার এই চাহিদা বুঝতে শুরু করেছে এবং সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টের মাধ্যমে তা পূরণ করছে। তবে কম রোজগেরে মানুষের কাছে এই সুযোগ পুরোপুরি অধরা। আগে শহরে ধর্মশালা ছিল। ইদানীং ধর্মশালার পাট প্রায় চুকে গেছে। ফলে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মর্মন্তুদ নজির, মুম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের রুগি ও তাদের

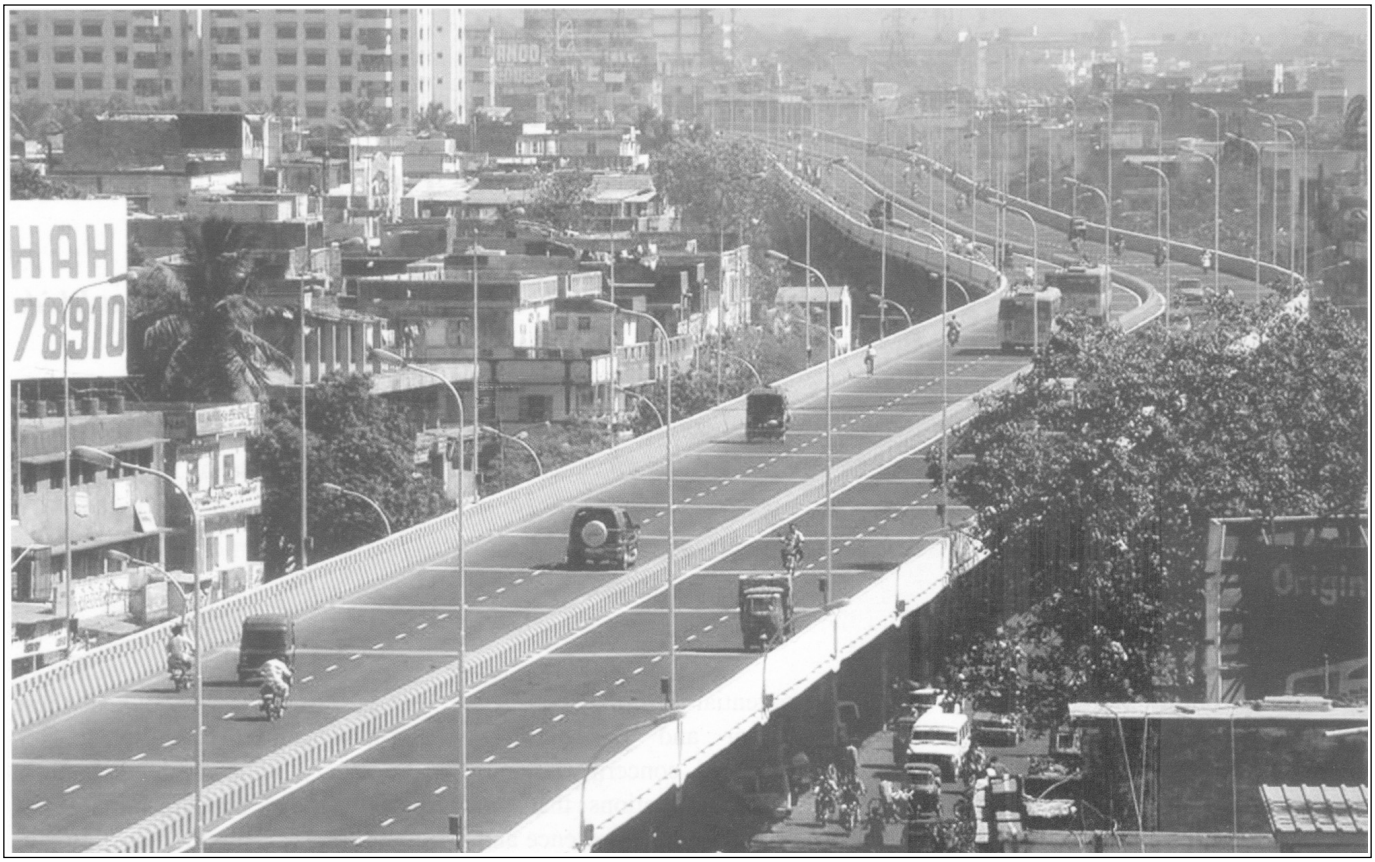

পরিচর্যাকারীদের মাস কয়েক হাসপাতালের বাইরে পথেঘাটে দিন কাটানোর ছবি।

আবাসন নিয়ে ইদানীংকার ধ্যানধারণা স্বল্পকালীন আবাসন সমস্যা সমাধানের পথে আর এক বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আবাসন নীতি দাঁড়িয়ে আছে দু'টি গোদা নীতির উপর : প্রথমটি হল মালিকানাভিত্তিক ঘরদোর এবং অন্যটি হচ্ছে জমিকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার। প্রথম নীতিটি নাগরিকতা সৃষ্টি করে। একটা স্থানে বিনিয়োগ এবং তার প্রতি এক নাগাড়ে দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে এ এক কেজো হাতিয়ার। আর দ্বিতীয়টি জমি থেকে টাকা আয়ে সাহায্য করে এবং সরকারকে রাজস্ব জোগায়। তবে এ দুই নীতি হাতিয়ারের নেতিবাচক দিক হল, তারা স্বল্পকালীন আবাসনের সম্ভাবনায় সীমা টেনে দেয় এবং শহরে আশ্রয়ের জন্য জায়গার পরিসর ক্ষুণ্ণ করে। সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা না থাকলে, বিনিয়োগমুখী আবাসন ব্লক ছেয়ে ফেলবে শহরের সব জায়গা। আর্থিক ফায়দা লোটার এই মানসিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু তা না হওয়া অবধি শহরগুলিতে রাস্তাঘাটে মাথা গোঁজার দৃষ্টান্ত বেড়ে যাবে। 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দির'-এর ছবি তো আগেই এ নিবন্ধে দেখানো হয়েছে।

এসব ইস্যুতে সুশীল সমাজের সাড়া দেওয়ার নজির আছে বৈকি! প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য তা একেবারেই নস্যি। এছাড়া, বর্তমানের জমি এবং আবাসন বাজারের কার্যকলাপও এসব উদ্যোগ নিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সরকারের অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন স্তরের সরকারের এসব চাহিদা বোঝা এবং তাতে উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে। রাজ্য সরকার নয়। এ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান থাকার সুবাদে একমাত্র পঞ্চায়েত এবং পুরসভা এ বিষয়ে সাড়া দিতে পারবে। আবাসন ও অন্যান্য ইস্যুতে রাজ্য সরকার চলে মাথাভারী প্রশাসনের কথায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে। তাই রাজ্য সরকার-ভিত্তিক নীতিতে দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িটানা একান্ত প্রয়োজন। এসব ইস্যু জানাবোঝা, তথ্য জোগাড় এবং অভিবাসনের মতো গতিশীল বিষয়ে যথোপযুক্ত সাড়া দেওয়ার জন্য ক্ষমতা ও সঙ্গতি দিতে হবে পঞ্চায়েত ও পুরসভার মতো স্থানীয় প্রশাসনকে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Deshingkar, P. and Akter, S. (2009) : Migration and Human Development in India, Human Development Research Paper 2009/13. UNDP.
(২) Government of India (2017) : Economic Survey of India 2016-17 Volume 1.
(৩) Chandrashekhar, S. and Sharma, A (2014) : Urbanization and Spatial Patterns of Internal Migration in India,Working Paper 2014-16, IGIDR.
(৪) Chandrshekhar, S. and Dore P. (2014) : Internal Migration in India: Setting the Context in Urban India Vol 31, Issue 1, Jan-June 2014.
(৫) Naik, M. and Randolph, G. (2018) : Migration Junctions in India and Indonesia, Just Jobs Network and Centre for Policy Research.
(৬) Tumbe, C. (2016) : Urbanization, demographic transition and growth of cities in India 1870-2020, International Growth Centre C-35205-INC-1, 2016.

বনসৃজন : তেলেঙ্গানার ওয়াদারির দৃষ্টান্ত

চন্দ্রশেখর রেড্ডি

ভারতের বিরাট একটি অংশে দূষণের সমস্যা বিভীষিকার চেহারা নিয়েছে। শহরগুলির শ্বাসগ্রহণের জন্য চাই সবুজ আচ্ছাদন। অরণ্য ফিরিয়ে আনতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তেলেঙ্গানা। দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে কেবলমাত্র চারাগাছ রোপণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে 'তেলেঙ্গানাকু হরিথা হারামা' কর্মসূচির মাধ্যমে পরিপূর্ণ অর্থে 'অরণ্য' সৃজনের দিশায় কাজ চলছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। বিভিন্ন কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অরণ্য আচ্ছাদনের জায়গা নিতে পারে গড়ে তোলা বনাঞ্চল, এই ধারণাকেই পাথেয় করা হয়েছে সেখানে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে বনাঞ্চল রক্ষা এবং এসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে উঠেছে সারা দেশের কাছেই। তবে এদেশে আবহাওয়া ও মৃত্তিকার বৈচিত্র্যের জন্যই হয়তো অরণ্যের পুনঃসৃজন-এর বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনও সমীক্ষা হয়ে ওঠেনি এখনও।

দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে কেবলমাত্র চারাগাছ রোপণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে 'তেলেঙ্গানাকু হরিথা হারামা' কর্মসূচির মাধ্যমে পরিপূর্ণ অর্থে 'অরণ্য' সৃজনের দিশায় কাজ চলছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। বিভিন্ন কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অরণ্য আচ্ছাদনের জায়গা নিতে পারে গড়ে তোলা বনাঞ্চল, এই ধারণাকেই পাথেয় করা হয়েছে সেখানে। ভাবনাটির পথিকৃৎ জাপানের উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রফেসর আকিরা মিয়াওয়াকি। সুমানির মতো বিপর্যয়ের জেরে নাবাল এলাকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল ফিরিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যতে অরণ্য ধ্বংসের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সহজলভ্য উদ্ভিদের রোপণ এবং এক্ষেত্রে রোপণের ঘনত্ব হওয়া উচিত বেশি, এই দাওয়াই দিয়েছেন মিয়াওয়াকি। এদেশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনানী ফিরিয়ে আনতে প্রযুক্ত হচ্ছে ব্যয়সাশ্রয়ী ইয়াদারি স্বতঃস্ফূর্ত অরণ্য সৃজন নিদর্শ বা Yadari National Forest (YNF) Model। এই পন্থায় মিয়াওয়াকি প্রণালীর সঙ্গে মিশেছে স্থানীয় কিছু রীতিনীতি।

অরণ্য সৃজনে মিয়াওয়াকি প্রণালী

- গাছগুলির মধ্যবর্তী পরিসরের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না থাকা।
- চারাগাছ রোপণের আগে মৃত্তিকাকে উর্বর করে তোলা।
- গুল্ম এবং চারাগাছ রোপণের ঘনত্ব বেশি হওয়া। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ হাজার পর্যন্ত গাছ থাকতে পারে।
- পরবর্তীতে এলাকায় সহজলভ্য গাছের বীজ ছড়ানো।
- রোপণের পর প্রথম বর্ষা না আসা পর্যন্ত জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করা।
- একসঙ্গে অনেক জল ঢেলে না দেওয়া।
- গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখতে এবং আগাছার বাড়বাড়ন্ত রুখতে খড় জাতীয় আস্তরণের ব্যবস্থা করা।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কাজ চলার সময়ে কোনও গাছকে স্থানান্তরিত না করা।
- রোপণের পর প্রথম বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আগাছা সাফ করা।
- রোপণের ক্ষেত্রে প্রচুর ডালপালা হয় এমন গাছ (বট, অশ্বত্থ) পরিহার করা।
- বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রোপণ করা, যাতে অঞ্চলটিকে স্বাভাবিক অরণ্যের মতো দেখতে লাগে।
- মৃত্তিকার গুণাগুণ আগেই পরীক্ষা করে নেওয়া, যাতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সর্বোত্তম পন্থা অনুযায়ী এগোনো যায়।

[লেখক তেলেঙ্গানার বনদপ্তরের হায়দরাবাদ মণ্ডলের অতিরিক্ত মুখ্য বনপাল এবং Forest College and Research Institute-এর Dean। ই-মেল : chandrasreddyg@gmail.com]

নির্বাচিত স্থানের আগাছা নির্মূলীকরণ

● আগাছা ছাড়া অন্য কোনও স্বাভাবিক গাছ উপড়ে না ফেলা।

YNF প্রণালী কার্যকর করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের উদ্ভিদরোপণ এবং তার ফল সংক্রান্ত নথিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মতামত নেওয়া হয় বিভিনত্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ আধিকারিকদের কাছ থেকে। সবুজ আচ্ছাদনের প্রসার, চরম আবহাওয়ার সমস্যা দূর করা এবং পতিত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ফলদায়ী হয়ে উঠতে পারে এই প্রণালী। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি বনসৃজনে খরচ পড়ে ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা।

১. পদ্ধতি (Methodology) :

YNF প্রণালীর মূল কথা হল ছোটো জমিতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ রোপণ। দু'টি গাছের মধ্যেকার পরিসর-এর বিষয়ে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রতি হেক্টরে রোপণের ঘনত্ব ১০ হাজার পর্যন্ত হতে পারে। উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নির্ভর করে জমি নির্বাচন, জমির মান উন্নয়ন, উদ্ভিদ নির্বাচন, বীজের মান, রোপণের ধরন, জৈবসারের ব্যবহার এবং রোপণ পরবর্তী দেখভালের ওপর।

● জমি নির্বাচন এবং তা আগাছামুক্ত করা।

জায়গা বেছে নেওয়ার পর, সেখানকার গাছগুলিকে অক্ষত রেখে আগাছা সাফ করা জরুরি। মাটি অনুযায়ী রোপণ এবং জৈবসারের বিষয়টি স্থির করতে হবে চিন্তাভাবনা করে।

● মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং তাকে আরও উর্বর করা।

এই বিষয়টি, বিশেষত প্রথম পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদক্ষেপগুলি হল :

(i) এক একর জমির মাটি ৩০ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে তোলা। ওই মাটি চারদিকে জমা রাখা।

(ii) এরপর ওই জমির ১০ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত লাঙল চষা (plough)।

(iii) চষা জমির ওপর শুকনো বা সবুজ পাতার ৫ সেন্টিমিটার পুরু আস্তরণ তৈরি করা। এজন্য প্রায় চার টন পাতা লাগবে।

(iv) জায়গাটি ফের মাটি চাপা দেওয়া। এক্ষেত্রে খুঁড়ে তোলা মাটির কিছুটা ব্যবহার করতে হবে। এই পর্যায়ে আস্তরণটি হবে ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পুরু। এর পর তিন দিন চলবে জল দেওয়ার কাছ, যাতে মাটির নিচে থাকা পাতা, গুল্ম পচে যায়।

(v) এর পর এলাকায় ২ টনের মতো মিশ্র ও কেঁচোসার এবং ৪ টনের মতো গোবরসার ছড়িয়ে দিতে হবে।

(vi) ষষ্ঠ ধাপে জায়গাটি ফের মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া। আস্তরণ হবে ১৪ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পুরু।

(vii) তিন দিন ধরে চলবে জল দেওয়ার কাজ।

(viii) তিন সপ্তাহ পরে গোটা জমিতে হবে লাঙ্গল চষা।

(ix) ৩০ ঘন সেন্টিমিটার গর্ত তৈরি করে রোপণ করতে হবে চারা গাছ। খুব ছোটো চারার ক্ষেত্রে একটু মাটি তুললেই হবে। মাটি উর্বর করার অন্যান্য পন্থা—

✶ প্রথম প্রণালী : বসতির কাছাকাছি অঞ্চল—

(ক) নির্বাচিত জমিতে তিন মাস ধরে রাতের বেলা গরু, ছাগল, ভেড়া রেখে দেওয়া, যাতে জায়গাটি গবাদি পশুর দেহবর্জ্যে ভরে যায়। এর ফলে আপনা

৩০ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত মাটি খোঁড়া

শুকনো পাতা ইত্যাদির ব্যবহারের উর্বরতা বৃদ্ধি

আপনিই তৈরি হবে সার। গবাদি পশু ওই জায়গায় রাখার জন্য স্থানীয় মানুষ ও কৃষকদের দিতে হবে অর্থসহায়তা।

(খ) জুন মাসে বর্ষা শুরুর সময় লাঙল চষে সার দেওয়া এবং বীজ ছড়ানো। ২ মাস পরে আরও একবার লাঙল চষার কাজ করতে হবে।

(গ) এর পর ৩০ ঘন সেন্টিমিটার গর্ত খুঁড়ে চলবে রোপণ।

(ঘ) আস্তরণ তৈরির ক্ষেত্রে ধানের অবশিষ্টাংশের চেয়ে কচি নিমপাতা ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ তা মাটির জলীয়ভাবকে ধরে রেখে উর্বরতা বাড়ায়।

✶ **দ্বিতীয় পন্থা :** সংরক্ষিত বন এলাকায়—

(ক) গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেছে এমন জায়গা খুঁজে মাটি ফেলা শুরু করা (soil plugging)।

(খ) অঞ্চলটিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং গোবর জাতীয় পদার্থ ফেলে রেখে

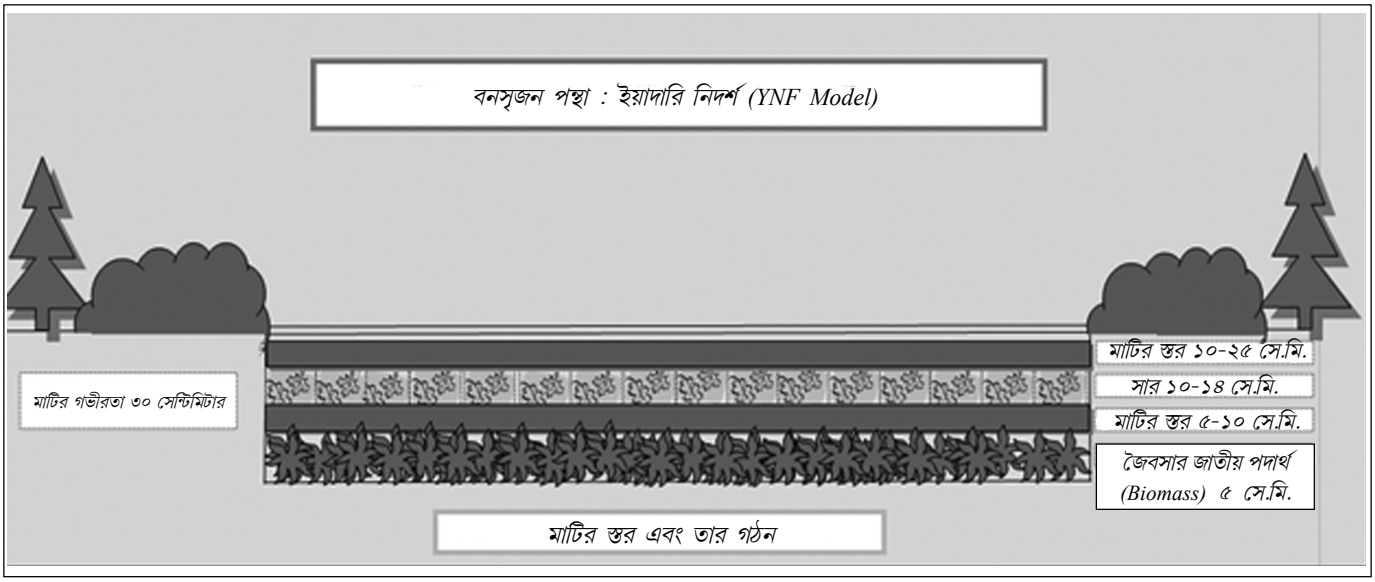

মিশ্র সার তৈরি করা, যাতে জমির উর্বরতা বাড়ে।

(গ) প্রথম বর্ষায় পাতা, কাজে না লাগা শাক-সবজি ফেলে রেখে পচিয়ে সার তৈরি করা। ২ মাস বাদে লাঙল চষা।

(ঘ) ৩০ ঘন সেন্টিমিটার গর্ত খুঁজে রোপণের কাজ করা।

(ঙ) আস্তরণ তৈরির (mulching) ক্ষেত্রে ধানের অবশিষ্টাংশের বদলে নিমপাতা এবং ডাল ব্যবহার করাই বিধেয়।

✶ **তৃতীয় প্রণালী :** শহুরে এলাকায় বনসৃজন ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলি হল—

(ক) জায়গা চিহ্নিত করে লাঙল চষা।

(খ) ঝরে পড়া পাতা, বাজারের শাক-সবজির অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি ওই জায়গায় ফেলে মিশ্র সার তৈরি।

(গ) আরও একবার লাঙল চষার পর ৩০ ঘন সেন্টিমিটার গর্ত করে রোপণের কাজ করা।

(ঘ) আস্তরণ তৈরির ক্ষেত্রে নিমপাতা ব্যবহার।

● **এলাকায় সহজলভ্য উদ্ভিদ প্রজাতি রোপণ :**

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সহজলভ্য উদ্ভিদের ব্যবহারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হলে গাছ টেঁকার সম্ভাবনা থাকে বেশি। যেসব গাছের গুঁড়ি সোজা এবং ডালপালার বিস্তার মাঝামাঝি সেরকম গাছই ব্যবহার করতে হবে। রোপণের ঘনত্ব এবং ধরনধারণ হবে এইরকম :

(i) বিভিন্ন কলেবরের গাছের চারা রোপণ করতে হবে, যাতে বনভূমির স্বাভাবিকতা বজায় থাকে।

(ii) প্রতি একর জমিতে ২০-টি প্রজাতির চার হাজার গাছ রোপণ করলে ভালো।

(iii) বট বা যে ধরনের গাছের প্রচুর ডালপালা হয় সেগুলি পরিহার করা ভালো।

(iv) পর্ণমোচী এবং চিরহরিৎ গাছ রাখতে হবে সমান অনুপাতে।

(v) রোপণের পর ভূমির আচ্ছাদন তৈরি করতে হবে শুকনো ঘাস দিয়ে।

● **জলসেচন :**

একসঙ্গে অনেক জল না ঢেলে পাইপের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে (pipe sprinklers)।

● **রোপণ পরবর্তী কর্তব্য :**

পরবর্তী বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আগাছা সাফ করতে হবে। তৃণভোজী প্রাণীদের থেকে রক্ষা করতে হবে চারাগাছ। দরকারে বেড়া দেওয়া বা নজরদারি চলতে পারে। তবে চারপাশে পরিখা না তৈরি করা ভালো, কারণ মাটির পক্ষে পুষ্টিকারক সব পদার্থই চুঁইয়ে সেখানে গিয়ে জমা হওয়ার প্রবণতা থাকে।

২. ফলাফল :

● বেশি জীববৈচিত্র্য থাকে এধরনের বনাঞ্চলে।

● এক বছরের মধ্যে প্রজাপতি, কাঠবিড়ালি, নানা ধরনের পাখি, সরীসৃপের আবাসস্থল হয়ে ওঠে এই ধরনের বনাঞ্চল।

● নানান ধরনের গাছ থাকায় দেখতে লাগে প্রাকৃতিক অরণ্যের মতো।

● এলাকার বায়ুর কার্বন অনেকটাই শুষে নেয় এই বনাঞ্চল।

● ধীরে ধীরে স্থায়ী বনভূমি হয়ে ওঠে অঞ্চলটি।

৩. বনভূমি তৈরি করার উপযুক্ত জায়গা ও উপযোগিতা :

● যেসব জায়গায় (প্রাকৃতিক অরণ্যের ঘনত্ব শ্রেণির নিরিখে) উদ্ভিদ/গাছপালার ঘনত্ব ০.১-এর কম।

● সৃষ্ট বনাঞ্চল মৃত্তিকা এবং জল সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে (কারণ, বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ এবং মাটির মধ্যে থাকা শেকড়ের ঘনত্ব)।

● জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সিমেন্টের ট্যাঙ্ক তৈরির চেয়ে এধরনের উদ্যোগ বহুলাংশে শ্রেয়। কারণ রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা এখানে সেভাবে নেই।

● একটি গ্রামে প্রতিবছর ১ লক্ষ উদ্ভিদ সমাহারে ১০ হেক্টর (Ha) বনাঞ্চল তৈরি করা যায়। ৫ বছরে ৫০ হেক্টর জমিতে ৫ লক্ষ উদ্ভিদ সমাহারে অরণ্য তৈরি হয়ে উঠতে পারে।❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এক নিদারুণ সমস্যা

এস. এস. ছিনা

ধানের খড় এমন কোনও সমস্যা নয় যে, তার সমাধান নেই। বরং, তা বেশ সহজসাধ্য এবং খড় থেকে বাড়তি দু'টো পয়সার মুখ দেখা যায়। আপদ নয়, বিচুলিকে এক সম্পদ রূপে দেখা দরকার এবং তা অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুত সুনিশ্চিত করতে ধান চাষের এলাকা খুব একটা কমানো সম্ভব নয়। কাগজ এবং পিজবোর্ড তৈরি, বিচুলি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে মাশরুম চাষ ইত্যাদির মতো ব্যবস্থা মারফত খড় পোড়ানোর সমস্যা মেটাতে হবে।

চাষের মাঠে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোজনিত দূষণ উত্তর ভারতের এক বড়ো অংশে বছরকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লি-সহ ধান চাষের রাজ্যগুলি এই সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। ফসলের গোড়া চাষির কাছে এক ঝক্কিবিশেষ। ধান কাটা এবং আর এক বড়ো শস্য গম বোনার মধ্যে সময়ের ফারাক্কা যৎসামান্য। খড় তুলে জমি সাফসাফাই করে ঠিকঠাক মরশুমে গমের বীজ ছড়াতে চাষিদের হাতে সময় বিশেষ একটা থাকে না। খড় তোলার খরচ আছে। ফসলের গোড়ার দিকটা জ্বালিয়ে দিলে ক্ষেতের উর্বরতাও বাড়ে কিছুটা। খড় তাই জমিতেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সার্বিক দৃষ্টিতে দেখলে, পাঞ্জাবে ধান চাষের এলাকা বাড়াটা কোনও চিন্তাভাবনাহীন কাণ্ড নয়। দেশের খাদ্য ঘাটতি মেটাতে তা সাহায্য করেছে। ওই রাজ্যে আগে ধান চাষের তেমন একটা চল ছিল না। বিদ্যুতের জোগান মেলার সুযোগ বাড়ায় টিউবওয়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। খারিফ মরশুমে আগে সেখানে ডাল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের চাষ হ'ত। জলের জোগান হাতের নাগালে আসায় এখন সেসব ফসলের জায়গায় ধান চাষ হচ্ছে। ধান মজুতের ৬০ শতাংশ পাঞ্জাবের অবদান। অথচ দেশে ধানচাষের জমির মাত্র ১.৫ শতাংশ ওই রাজ্যের এলাকায়। ধানের নুড়ো পোড়ানোর ঝামেলা ছাড়াও, পাঞ্জাব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সার ব্যবহার, জলের স্তর নামা ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছে।

ধানের খড় এমন কোনও সমস্যা নয় যে, তার সমাধান নেই। বরং, তা বেশ সহজসাধ্য এবং খড় থেকে বাড়তি দু'টো পয়সার মুখ দেখা যায়। আপদ নয়, বিচুলিকে এক সম্পদ রূপে দেখা দরকার এবং তা অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। তাদের ক্ষমতা, উদ্যম এবং উদ্যোগীক মানসিকতার জন্য পাঞ্জাবের চাষির নামডাক যথেষ্ট। লাভজনক হলে তারা কোনও কিছুতে পিছপা নয়, সে কাজে নেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। কখনও-সখনও কিন্তু রাষ্ট্রের তরফে উৎসাহ এবং আর্থিক সহায়তা জোগান জরুরি। ফসলের বাজারের নিশ্চয়তা দেওয়ার পাশাপাশি, সরকার ন্যূনতম সহায় মূল্যে ধান কিনে থাকে। গম এবং ধান সরকার কিনে নেয় বলে এই দুই ফসলের বিক্রি নিয়ে চাষিদের কোনও ঝামেলা পোহাতে হয় না। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষিত এমন অন্য ২৩-টি ফসলের বেলায় কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়ার নিশ্চয়তা নেই। খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুত সুনিশ্চিত করতে ধান চাষের এলাকা খুব একটা কমানো সম্ভব নয়। কাগজ এবং পিজবোর্ড তৈরি, বিচুলি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে মাশরুম চাষ ইত্যাদির মতো ব্যবস্থা মারফত খড় পোড়ানোর সমস্যা মেটাতে হবে। কিন্তু অনেকের মনে খুঁতখুঁতুনি

[লেখক সিনিয়র ফেলো, ইনস্টিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস, দিল্লি এবং প্রাক্তন ডিন, কৃষি ফ্যাকাল্টি, খালসা কলেজ, অমৃতসর। ই-মেল : sarbjitchhina@yahoo.co.in]

আছে যে, ব্যক্তিগতভাবে চাষি এসব কাজে নামবে কিনা। চাষির খেতখামারের আয়তন বড়ো হলেও এ সন্দেহ থেকেই যায়। এছাড়া, বড়ো জোতের চাষির পক্ষেও এধরনের কাজে লেগে পড়াটায় আর্থিক লাভ হবে না, কেননা খড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে অনেক জায়গা জুড়ে। সেই খড়বিচুলি জড়ো করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা বেশ ঝক্কি।

ডেয়ারি ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সমবায়ের মডেল (cooperative model) তাই এব্যাপারে বেশ বাস্তবোপযোগী। খড় পোড়ানোর সমস্যা মোকাবিলার জন্য এ এক বিচক্ষণ উপায়। প্রতিটি ব্লকে নিদেন দু'টি পিজবোর্ড এবং কাগজ তৈরির ইউনিট থাকা চাই। স্থানীয় চাষি এবং ক্ষেতমজুরদের সদস্য করে এলাকায় সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। ওই সমিতিকে অবশ্যই ধানের খড় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রাজ্য সমবায় ফেডারেশনের অনুমোদন পেতে হবে। সমবায় দপ্তর ইতোমধ্যেই এই ধরনের সমবায় উদ্যোগকে সাহায্য ও আর্থিক সুযোগসুবিধে দেওয়ার কাজে লেগে পড়েছে। শুধুমাত্র ফসলের নুড়ো পোড়ানোর সমস্যার মোকাবিলা নয়, রাজ্যে আয় এবং কাজের সুযোগ তৈরি করতেও সরকারের এহেন আনুকুল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা সবচেয়ে ভালো ফল আনতে পারে।

বায়ো-গ্যাস উৎপাদনের জন্য চাই কারিগরি সাহায্য এবং বায়ো-গ্যাস তৈরির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য এব্যাপারে উৎসাহীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্যোগের ক্ষেত্রেও একই ধাঁচের সমবায় ব্যবস্থা সারা রাজ্যে চাষি এবং ক্ষেতমজুরদের সাহায্য করতে পারে।

বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রী ড. জি. এস. ভাল্লার পর্যবেক্ষণ, ১০ একরের কম জমি থাকলে জীবনযাত্রার মোটামুটি মান ধরে রাখা যায় না। পাঞ্জাবে কিন্তু ৮৯ শতাংশ চাষির জমিজমা এর চেয়ে কম। এসব চাষিমানুষ তাই দাম পড়ে যাওয়া বা ফসল বেচার অনিশ্চয়তার কোনও ঝুঁকি নিতে অক্ষম। ধানের বেলায়, দাম এবং বিক্রির নিশ্চয়তা আছে। পরিবর্ত শস্যের চাষ বাড়াতে হলে, সেই ফসলের দাম এবং বেচারও একই গ্যারান্টি থাকা জরুরি।

বাসমতী এক ধরনের সুগন্ধী মিহি চাল। ভারত এবং পাকিস্তানে এর চাষ বেশি। পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর দারুণ কাটতি। বিদেশের বরাত মেটাতে রপ্তানিকারীদের হিমশিম দশা। বিচুলি পোড়ানোর সমস্যায় ভুগলেও, পাঞ্জাব এই বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের চাষ তুলে দিতে পারে না। ২০১৭-'১৮ সালে এক বাসমতী পাঠিয়েই আয়ের অঙ্ক প্রায় ২৬,৯০০ কোটি টাকা (রাজকুমার এবং সিং, ২০১৯)। আর পাঞ্জাবই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড়ো বাসমতী রপ্তানিকারী রাজ্য।

ফসলের নুড়ো পোড়ানো বন্ধ করতেই হবে। তবে কিনা বাস্তব সমস্যায় নজর দিয়ে এবং সেইসঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিজীবীদের দুশ্চিন্তা মাথায় রেখে পরিবর্ত ব্যবস্থা মারফত সংকট থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। ঝামেলা মোকাবিলায় সমবায় মডেলই সবচেয়ে উপযোগী এবং বেশ টেঁকসই কর্মকৌশল। কিছুটা কম কিন্তু নিশ্চিত আয় নিয়ে ছোটোখাটো চাষি সন্তুষ্ট থাকবে। বাণিজ্যিক ফসল চাষের দিকে ঝুঁকবে না। ঝোপের দুই পাখির চেয়ে হাতের একটিই ভালো। কেননা, বাণিজ্যিক ফসলে লাভের সম্ভাবনা বেশি ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে আছে পড়তি দাম এবং ফলন কমতির আশঙ্কাও।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Statistical Abstract of Punjab (2017).

(২) Statistics of Punjab Agriculture, Punjab Agricultural University, Ludhiana (2017).

(৩) Commission for Agricultural Costs and Prices, Government of India (2016).

(৪) G S Bhalla. Condition of Indian Peasantry, National Book Trust (2006).

(৫) Raj Kumar & Jasdev Singh. Extension article on Basmati, Department of Economics and Sociology, PAU, Ludhiana (2019).

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ : ক্রেতাদের ক্ষমতায়নে এক নতুন মাইলফলক

শীতল কাপুর

২০১৯ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে 'ক্রেতা' শব্দের সংজ্ঞায় অফলাইন ও অনলাইন, দুই ধরনের ক্রেতাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'যেকোনও দ্রব্য ক্রয়' এবং 'যেকোনও পরিষেবা ভাড়া করা বা পাওয়া' শব্দবন্ধে অফলাইনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা টেলিশপিং বা সরাসরি বিক্রয় বা বহুস্তরীয় বিপণনের ক্ষেত্রে অনলাইন লেনদেনগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা এবং দ্রুত বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন।

প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর দিনটি জাতীয় উপভোক্তা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। উপভোক্তা আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর এই দিনটি আলোকপাত করে, প্রতিটি ক্রেতাকে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের বিষয়ে আরও সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। নতুন ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯-এর বিভিন্ন সংস্থানে নতুন যুগের বাজার সংক্রান্ত নানা বিষয় ও বিবাদ নিষ্পত্তির কার্যকর উপায়ের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এই নিবন্ধে আমরা এই আইনটি নিয়েই আলোচনা করবো।

ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ই-কমার্স, স্মার্ট ফোন, ক্লাউড প্রযুক্তি প্রভৃতির সুবাদে ভারতীয় বাজার গত দু'দশকে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় এর আগে ১৯৮৬ সালের যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন ছিল, তা এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিল না। বিশেষত অনলাইন কেনাকাটা, টেলিশপিং, পণ্য প্রত্যাহার, ঝুঁকিপূর্ণ চুক্তি এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই আইন ক্রেতাদের যথাযথ সুরক্ষা দিতে পারছিল না। সেজন্যই এর বদলে ২০১৯ সালের নতুন ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ভাবনা।

বিচারে বিলম্ব আর বিচার না পাওয়া সমার্থক

ক্রেতা সুরক্ষা আদালতগুলিতে বকেয়া মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ছোটো ছোটো অঙ্কের বিবাদের নিষ্পত্তি হতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। তাই উপভোক্তাদের ক্ষমতায়নে নতুন আইন প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উপভোক্তাদের সুরক্ষা এবং তাদের দ্রুত ন্যায় বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ সংসদে অনুমোদিত হয়। চলতি বছরের ৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করেন। নতুন এই আইন ১৯৮৬ সালের আইনের জায়গা নিয়েছে। এতে উপভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ক্রেতাদের সাধারণত যেসব সমস্যা ও অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, নতুন আইনে নানা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যস্থতা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় উপভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ

১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন কার্যকর হবার পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। এবার বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এর উদ্দেশ্যগুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখার পাশাপাশি এর সাংগঠনিক কাঠামো ও খামতিগুলি খতিয়ে দেখার সময় হয়েছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ সংসদে অনুমোদিত হবার পর চলতি বছরের ৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের সুরক্ষা দেওয়া এবং দ্রুত বিকল্প, অর্থাৎ অসন্তুষ্ট ক্রেতারা যাতে দ্রুত বিচার পান, তার ব্যবস্থা করা।

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা নেহেরু কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। ই-মেল : sheetal_kpr@hotmail.com]

গঠন প্রভৃতির সংস্থান রয়েছে এতে। তবে নতুন এই আইনের বিধিনিয়মগুলি এখনও কার্যকর হয়নি। আসুন, এই ফাঁকে একবার দেখে নেওয়া যাক, নতুন এই আইন কী কী সুবিধা দেবে এবং ১৯৮৬ সালের পুরনো আইনের সঙ্গে এর পার্থক্যই বা কী।

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র খামতি

১৯৮৬ সালে এই আইন পাস হওয়ার পর ৩০ বছর কেটে গেছে। সময় এসেছে এর উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কাঠামো খতিয়ে দেখে খামতিগুলি চিহ্নিত করার। ১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন যখন চালু হয়েছিল, তখন ভারতে ক্রেতা স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি মাইলফলক।

ক্রেতা স্বার্থরক্ষা ও বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুধুমাত্র ক্রেতাদের জন্য জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে ত্রিস্তরীয় আধা বিচারবিভাগীয় একটি আইনি পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছিল এর সুবাদে। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতগুলি স্থাপন করা হয়েছে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে। উপভোক্তাদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আধা-বিচারবিভাগীয় একটি কর্তৃপক্ষ গঠন, যে কর্তৃপক্ষের ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা থাকবে। তবে গত কয়েক বছর ধরে এইসব ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে প্রচুর মামলা বকেয়া পড়ে রয়েছে। ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের খামতিগুলি হল :

(ক) পুরনো এই আইনের পক্ষে বাজারের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬-র ১৩ (৩এ) ধারায় বলা হয়েছে, ‘‘প্রতিটি অভিযোগ দ্রুততার সঙ্গে শুনে ও খতিয়ে দেখে অন্য পক্ষকে দেওয়া নোটিসের তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনও পণ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এই সময়সীমা ৫ মাস হতে পারে।’’ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বকেয়া মামলার পাহাড় ও ঘন ঘন মুলতুবির জেরে এই সময়সীমার কোনও গুরুত্বই থাকছে না।

(খ) ক্রেতা কমিশনগুলি বকেয়া মামলার চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার চুক্তিগুলি বিক্রেতার দিকে পক্ষপাতদুষ্ট। বিবাদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

সারণি-১
স্থাপনের পর থেকে উপভোক্তা ফোরামগুলিতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা (৫/৭/২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	এজেন্সির নাম	মোট দায়ের হওয়া মামলার সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	বকেয়া মামলা	নিষ্পত্তির হার (শতাংশে)
১.	জাতীয় কমিশন	১২২০৪২	১০৩৫২০	১৮৫২২	৮৪.৮২
২.	রাজ্য কমিশন	৭৮৮৪৬৩	৬৭৮১২৪	১১০৩৩৯	৮৬.০১
৩.	জেলা ফোরাম	৩৯০৩৭০৬	৩৬০৫৬৭৩	২৯৮০৩৩	৯২.৩৭
	মোট	**৪৮১৪২১১**	**৪৩৮৭৩১৭**	**৪২৬৮৯৪**	**৯১.১৩**

সূত্র : www.ncdrc.nic.in

(গ) ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের সভাপতি ও সদস্যরা বিবাদ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই পদ্ধতির প্রতি উপভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে কিনা, তা তাদের কাজের ওপরেই নির্ভর করে। অথচ বিভিন্ন ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে সভাপতি ও সদস্যদের চারশোরও বেশি পদ খালি পড়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির তরফে এই শূন্যপদ পূরণের তেমন কোনও তৎপরতা চোখে পড়ে না, রাজনৈতিক দলগুলিও এই নিয়ে নিশ্চুপ থাকে।

(ঘ) উপভোক্তা কমিশনের সদস্যদের অন্যান্য দপ্তর থেকে আনা হয়। বিচারবিভাগীয় কাজ সম্পর্কে প্রায়শই তাদের কোনও ধারণা থাকে না। তাই কাজে নিযুক্ত করার আগে তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(ঙ) উপভোক্তা কমিশন অনেক সময়েই খুব সামান্য অঙ্কের ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়, সেই অর্থ আদায় করতেও ক্রেতাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।

(চ) ঠিক সময় মামলার নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে সভাপতি ও সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়, প্রায়শই এক-একটি মামলা দশ থেকে পনেরো বার মুলতুবি করা হয়।

(ছ) কোনও ক্ষেত্রে বহু মানুষ একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও (যেমন, বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে) জাতীয় ও রাজ্য কমিশনের সভাপতির হাতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার থাকে না।

ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের হিসাব মতো বিভিন্ন ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে ৪ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি মামলা বকেয়া পড়ে আছে। অথচ উপভোক্তাদের স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত ন্যায়বিচার দেওয়ার মূল লক্ষ্য নিয়েই ক্রেতা সুরক্ষা আদালতগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। সেজন্যই এই আদালতগুলিতে উপভোক্তারা নিজেরাই নিজেদের হয়ে সওয়াল করতে পারতেন। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, আইনের জটিলতার জন্য অনেক উপভোক্তা আইনজীবীদের সাহায্য নিচ্ছেন এবং মামলাগুলি বারে বারে মুলতুবি হয়ে যাচ্ছে, যা গোটা বিচার প্রক্রিয়াটাকেই শ্লথ করে দিচ্ছে।

সারণি-১ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, জেলা ফোরামগুলির কর্মদক্ষতা বেশি। সেখানে দায়ের হওয়া ৯২.৩৭ শতাংশ মামলারই নিষ্পত্তি হয়েছে।

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯

এই আইনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা এবং দ্রুত বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন। এই আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল :

(ক) ২০১৯ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ‘ক্রেতা’ শব্দের সংজ্ঞায় অফলাইন ও অনলাইন, দুই ধরনের ক্রেতাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘যেকোনও দ্রব্য ক্রয়’ এবং ‘যেকোনও পরিষেবা ভাড়া করা

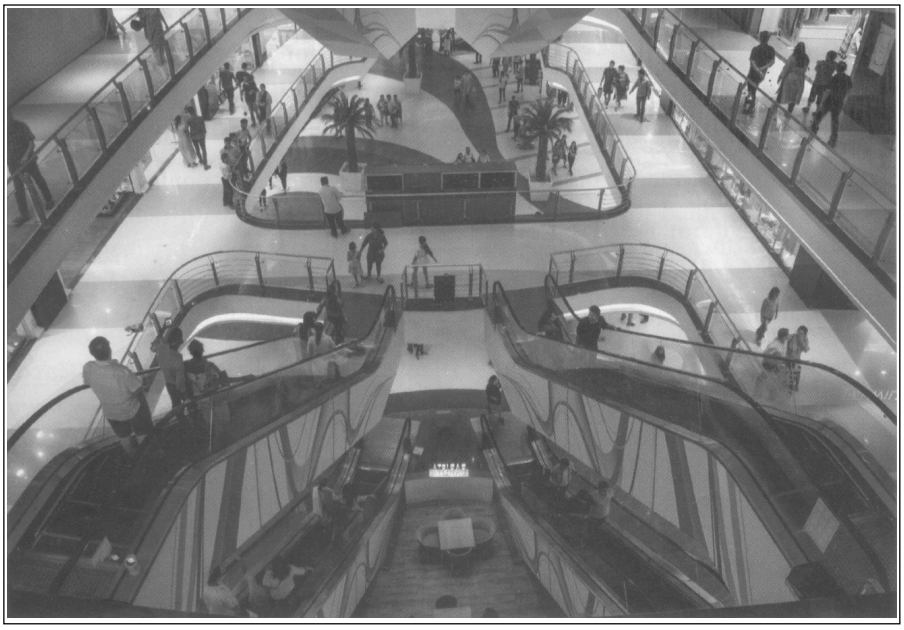

বা পাওয়া' শব্দবন্ধে অফলাইনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা টেলিশপিং বা সরাসরি বিক্রয় বা বহু স্তরীয় বিপণনের ক্ষেত্রে অনলাইন লেনদেনগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(খ) কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (Central Consumer Protection Authority—CCPA) গঠন। ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা ও কার্যকর করা এর কাজ। অসাধু ব্যবসায়ের অভিযোগ পেলে তার তদন্ত এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার এই কর্তৃপক্ষের রয়েছে। ব্যবসায়ীকে পণ্য ফেরত নিতে, পণ্য বাজার থেকে তুলে নিতে এবং পণের মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশও কর্তৃপক্ষ দিতে পারে। CCPA যা যা করতে পারে তা হল :

(১) অসাধু ব্যবসায়ের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) সুরক্ষা নির্দেশিকা জারি;

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে বাজার থেকে পণ্য তুলে নিতে বা পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করতে নির্দেশ;

(৪) অভিযোগ অন্যান্য নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানো;

(৫) জরিমানা ধার্য করা;

(৬) ক্রেতা কমিশনে মামলা দায়ের;

(৭) ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা বা অসাধু ব্যবসা সংক্রান্ত মামলায় অংশগ্রহণ।

আইনের সংস্থান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের একটি তদন্ত শাখা থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মহানির্দেশক পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য CCPA ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে পারে। অনলাইন বিপণনও CCPA-র এক্তিয়ারের মধ্যে পড়বে। একই অপরাধ দ্বিতীয় বার করলে জরিমানার অঙ্ক বেড়ে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হবে। তার পরেও একই অপরাধ পুনরাবৃত্ত হতে থাকলে পণ্য বা পরিষেবার ওপর তিন বছর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। তবে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনকারীকে জরিমানা দিতে হবে না। কোনও বিজ্ঞাপনকে বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার প্রচার বন্ধ করার নির্দেশও দিতে পারে CCPA।

(গ) বিচারকারী সংস্থাগুলির আর্থিক এক্তিয়ার নতুন আইনে বাড়ানো হয়েছে। জেলা কমিশনগুলি এবার থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থমূল্যের বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারবে। রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে এই সীমারেখা ১ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা এবং জাতীয় কমিশনের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকার বেশি। অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতির সরলীকরণ করা হয়েছে। অনলাইনেও অভিযোগ জানানো যাবে।

(ঘ) যারা ভেজাল দ্রব্যের উৎপাদন, মজুত, বিক্রয় ও আমদানিতে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবার সংস্থান রয়েছে।

(ঙ) কোনও পণ্য ব্যবহার করে ক্রেতার ক্ষতি হলে সেজন্য উৎপাদককে সুনির্দিষ্টভাবে দায়বদ্ধ করার সংস্থান নতুন আইনে রয়েছে।

(চ) অভিযোগ নিষ্পত্তির বিকল্প উপায় হিসাবে 'মধ্যস্থতা'-র সংস্থান রয়েছে নতুন আইনে। এতে নিষ্পত্তি পদ্ধতি আরও দ্রুত, জটিলতামুক্ত ও সরল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মধ্যস্থতা করা হবে ক্রেতা ফোরামের তত্ত্বাবধানে।

(ছ) এছাড়াও অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতিকে সরল করে তুলতে একগুচ্ছ সংস্থান রয়েছে নতুন আইনে। বিচারকারী সংস্থাগুলির আর্থিক এক্তিয়ার বাড়ানো, দ্রুত বিচারের জন্য ক্রেতা ফোরামের ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা বাড়ানো, জেলা ও রাজ্য কমিশনকে নিজেদের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার অধিকার দেওয়া, বিচারের গতি বাড়াতে সার্কিট বেঞ্চ গঠন, জেলা ক্রেতা ফোরামের সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংস্কারসাধন, অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করার সুবিধা, ক্রেতার বাড়ির এলাকা যে ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের এক্তিয়ারে পড়ছে, সেই কমিশনেই অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ, অভিযোগ দায়ের করার ২১ দিনের মধ্যে উৎপাদক বা বিক্রেতার উত্তর না পাওয়া গেলে অভিযোগ মেনে নেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেবার সংস্থান প্রভৃতি এর নিদর্শন।

(জ) ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ই-কমার্স সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্রেতার কোনও পণ্য পছন্দ না হলে ১৪ দিনের মধ্যে ফেরত পাঠানোর সংস্থান বিক্রেতাকে রাখতেই হবে। যেসব বিক্রেতারা পণ্য ও সেবা সরবরাহ করছেন, তাদের বিশদ বিবরণ ই-কমার্স ওয়েবসাইটে দিতে হবে এবং ক্রেতাদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ই-কমার্স সংস্থাগুলিকে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। পণ্য ফেরত,

অর্থ ফেরত, পণ্য বিনিময়, ওয়ার‍্যান্টি/গ্যারান্টি, পণ্য সরবরাহ, অর্থ প্রদানের মাধ্যমে, অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ই-কমার্স সংস্থা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে হওয়া চুক্তি ওয়েবসাইটে জানাতে হবে যাতে ক্রেতারা সবকিছু জেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস, নিম্ন গুণমানের পণ্য, নকল পণ্য, তথ্য চুরি বা ফিশিং, এলাকা সংক্রান্ত এক্তিয়ার-সহ নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা অনলাইন ক্রেতাদের করতে হয়। বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, বিশেষত ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এবং কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের ক্রেতা সুরক্ষা কাউন্সিলগুলিকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নেবার অধিকার এখনও দেওয়া হয়নি। কেউ অভিযোগ জানালে তবেই এরা ব্যবস্থা নিতে পারে। যিনি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছেন, একমাত্র তিনিই আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের আদলে একইভাবে CCPA কাজ করবে। তার কাজ হল ক্রেতাদের অভিযোগের তদন্ত করা, পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধি জারি করা, পণ্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। ত্রুটিপূর্ণ পণ্য, পরিষেবায় খামতি, অসাধু ব্যবসা বা একচেটিয়া ব্যবসার জন্য উৎপাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ক্ষমতা ১৯৮৬ সালের আইনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও সরকার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ধারায় মামলা দায়ের করেছে, আজ অবধি এমনটা বিশেষ দেখা যায়নি।

ক্রেতা সুরক্ষা আদালতগুলিতে বিচারের গতি অত্যন্ত শ্লথ। তাই জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে আদালত সংলগ্ন কমিশনে মধ্যস্থতা কেন্দ্র স্থাপন করা হলে তা ন্যায়বিচার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৯ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ৭৪ থেকে ৮০ নম্বর ধারায় বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 'মধ্যস্থতা'-র কথা বলা হয়েছে। এর ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া একটি আইনি ভিত্তি পেল এবং এতে বিবাদ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরও সরল, জটিলতামুক্ত ও দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্যস্থতা কেন্দ্রগুলি ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের আওতায় কাজ করবে। মধ্যস্থতার দায়িত্বে কারা থাকবেন, তা স্থির করে দেবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

নতুন ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ৭৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারগুলি ক্রেতা সুরক্ষা আদালত ও তার প্রতিটি আঞ্চলিক বেঞ্চে একটি করে মধ্যস্থতা সেল স্থাপন করবে। প্রতিটি মধ্যস্থতা সেল জেলা কমিশন, রাজ্য কমিশন অথবা জাতীয় কমিশন, যার সঙ্গে সেটি যুক্ত, সেখানে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পেশ করবে। প্রতিটি সেলে যা যা রাখতে হবে তা হল :

(ক) প্যানেলভুক্ত মধ্যস্থতাকারীদের তালিকা;

(খ) সেল যেসব বিবাদের মধ্যস্থতা করেছে তার তালিকা;

(গ) মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার নথি;

(ঘ) নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশমতো অন্য যেকোনও তথ্য।

মধ্যস্থতাকারীদের প্যানেলের মেয়াদ হবে ৫ বছর। নিয়ন্ত্রকদের শর্তাবলী সাপেক্ষে প্যানেলভুক্তদের দ্বিতীয়বারের জন্যও পুনর্নিযুক্ত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্রেতা সুরক্ষা আদালত সংলগ্ন মধ্যস্থতা সেলে মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া চালাতে হবে (ধারা ৭৫)। এইসব উদ্ভাবনী পরিবর্তনের সুবাদে ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯, ক্রেতাদের ক্ষমতায়ন এবং দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানে বিশেষ সহায়ক হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Kapoor, Sheetal. (2019) *Consumer Affairs and Customer Care*, 2nd Edition, Galgotia Publishing Company.

(২) Aggarwal, V.K. (2015) *Consumer Protection: Law and Practice*, Bharat Law House, Delhi.

(৩) Misra, Suresh, (2017) "Is the Indian Consumer Protected? *One India One People*.

(৪) Ganesan, G. and Sumathy, M. (2012) *Globalisation and Consumerism: Issues and Challenges*, Regal Publications.

(৫) The Consumer Protection Act, 1986 (Bare Act)

(৬) The Consumer Protection Act, 2019 (The Gazette of India)

(৭) www.ncdrc.nic.in

(৮) www.consumeraffairs.nic.in

শহর, শহরতলি অঞ্চল এবং পশ্চাদ্‌ভূমি

ভি. নাথ

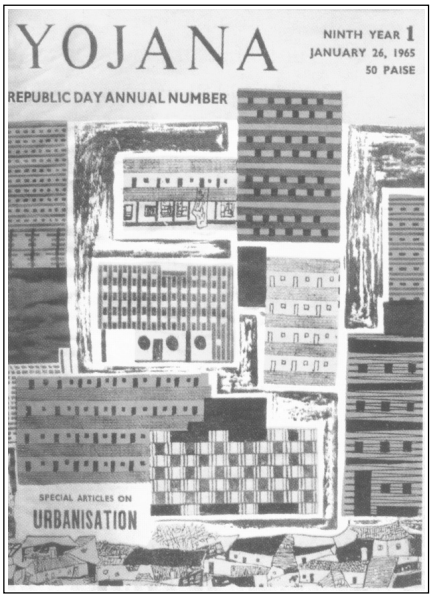

আমাদের দেশের শহরগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। কিন্তু এই বিকাশের মধ্য দিয়ে কি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থিক বিকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে? যোজনার ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এই নিবন্ধটি বড়ো প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্ন তুলে ধরেছে। শহর ও সেগুলির পশ্চাদ্‌ভূমির বিকাশ সম্বন্ধে পাঁচ দশক আগে লেখক যে ধারণা দিয়েছিলেন তা কীভাবে আজকের নগর পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হচ্ছে তা তুলে ধরতেই এই নিবন্ধটি আমরা পুনরায় প্রকাশ করছি।

সারা বিশ্বজুড়েই শহরগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। একদিকে যেমন বাড়ছে জনসংখ্যা, তেমনই এগুলির সীমানারও সম্প্রসারণ ঘটছে। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলিও শহরাঞ্চলের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে শহরগুলির সম্প্রসারণ এইভাবেই শুরু হয়েছিল। তারপর অটোমোবাইল আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরতলিগুলিও বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পরবর্তী দু'-দশক অর্থনৈতিক বিকাশের চাকাও ঘোরে। ফলে ত্বরান্বিত হল শহরগুলির সম্প্রসারণের গতি আরও। পশ্চিম ইউরোপের কিছু অংশ, আমেরিকার পূর্বাংশ ও জাপানে এই প্রক্রিয়ায় পার্শ্ববর্তী বড়ো ও ছোটো শহরগুলি একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে অতিবৃহৎ এক নগরাঞ্চলের জন্ম দেয়। এইভাবেই শহর ও গ্রামাঞ্চলের ফারাকটা ক্রমেই মুছে যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য আগে 'শহর', 'মেট্রোপলিটান এলাকা' 'কোনারবেশন' ইত্যাদি যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হ'ত সেগুলিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। জন্ম নেয় 'মেগালোপলিস'-এর ধারণা। এই ধারা যদি একালেও অব্যাহত থাকে তা হলে হয়তো অচিরেই উপকূলবর্তী গুজরাত (আহমেদাবাদ ও সুরাতের মাঝখানে) বা ধানবাদ ও কলকাতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের মেগালোপলিস গড়ে উঠবে। কারণ এই এলাকাগুলির পার্শ্ববর্তী বড়ো ও ছোটো শহরগুলিরও দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

মূলত শিল্পের অবস্থানের কারণেই শহরগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। বিরাট বাজার, পুঁজির সহজলভ্যতা তথা উদ্যোগ গ্রহণ ও কারিগরি দক্ষতার কারণেই এখানে শিল্প গড়ে উঠছে, বিশেষত, বাজার-কেন্দ্রিক ভোগ্যপণ্য শিল্প। এছাড়াও, যে শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সামগ্রীর ব্যবহার হয় (যেমন বৈদ্যুতিন, সরঞ্জাম, প্লাস্টিক) সেগুলিরও অতি দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ভারতের মতো অনেক দেশে শহরগুলিতেই আধুনিক শিল্পসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। শহরের কেন্দ্রে আরও বেশি করে শিল্প গড়ে তোলাটা মোটেই কাম্য নয়। তাছাড়া অনেক শহরে নতুন করে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভবও নয়। তাই শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে শিল্প গড়ে তোলার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। শহরগুলির বাইরে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা বা শিল্পের জন্য স্যাটেলাইট টাউনশিপ গড়ে কাজে উৎসাহ দিতে নগরাঞ্চলের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সচেষ্ট হতে হবে। বম্বে শহরের বাইরে থানে-কল্যাণ অঞ্চলের শিল্প তালুক, বা দিল্লিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফরিদাবাদ, শাহদরা এবং গাজিয়াবাদ শিল্প শহর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে যোজনার নগরায়ণ বিষয়ক সংখ্যায় এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক প্রাক্তন আইএএস এবং একজন উন্নয়নমূলক অর্থনীতিবিদ। তিনি যোজনা কমিশন, সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ও রাষ্ট্রসংঘে কর্মরত ছিলেন।]

শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা শহরগুলির সীমানা সম্প্রসারণের ফলে নগর পরিকল্পনা আদতে আঞ্চলিক পরিকল্পনার রূপ পাচ্ছে। শহরের মধ্যে কোনও একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের অবস্থানের চেয়ে জমির ব্যবহারের ধরনের একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ বেশি জরুরি (...particular institutions or facilities within a city to a clearer definition of the pattern of land use and functional relationships within a metropolitan region.)। দ্বিতীয়ত, পরিবহণ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে যে অঞ্চলগুলিতে শহরগুলি অবস্থিত সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শহরগুলির যোগ আরও ঘনিষ্ট হয়ে পড়ছে। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে কী কী বিকাশ বা পরিবর্তন ঘটছে শহরের পরিকল্পনায় তা বিশ্লেষণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলির পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতির মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, দিল্লির জন্য মাস্টার প্ল্যান রয়েছে, তাতে পরিকল্পনার মধ্যে গোটা দিল্লি রাজ্যকেই ধরা হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লি ও নয়াদিল্লি শহরের পাশাপাশি রয়েছে শাহদারা শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চল। সেইসঙ্গে এই পরিকল্পনায় পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির বিকাশের মধ্যেকার সম্পর্কের ওপরও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে যে উন্নয়ন বা পরিবর্তনগুলি ঘটছে (যেমন, প্রধান সড়ক বরাবর যে বিকাশ ঘটছে) সেগুলিও খতিয়ে দেখা হয়েছে এই পরিকল্পনায় এবং উন্নয়নের এই ধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে একগুচ্ছ সুপারিশও করা হয়েছে। স্যাটেলাইট টাউনশিপ (মূল শহর সংলগ্ন ছোটো শহর) গড়ে তোলার ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে সেব্যাপারে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লির সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত পশ্চাদ্‌ভূমি বা হিন্টারল্যান্ডের যে সম্পর্ক রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে এই পরিকল্পনায়।

শহর ও শহরতলির জন্য পরিকল্পনা

কলকাতার জন্য যে পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হচ্ছে তাতে পরিকল্পনার ইউনিট কিন্তু শুধুমাত্র কলকাতা শহর নয়, বরং পুরো কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা—যার আয়তন প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল। এর মধ্যে কলকাতা ও হাওড়ার পুরনিগমের আওতাভুক্ত অঞ্চল যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে প্রায় ৩৫-টি পৌরসভা এলাকা। এছাড়াও রয়েছে বহু গ্রাম। গ্রেটার বম্বে এলাকার জন্য বম্বে পুর নিগম সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা করেছে যার মধ্যে মূল বম্বে শহরের পাশাপাশি রয়েছে বিরাট শহরতলি ও মফঃস্বল এলাকা। এই পুরো এলাকার আয়তন প্রায় ১৭০ বর্গমাইল। এর পাশাপাশি, মহারাষ্ট্র সরকার ১,২৫০ বর্গমাইল বিস্তৃত এক বৃহৎ অঞ্চলের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দিয়েছে যার মধ্যে গ্রেটার বম্বে এলাকা ছাড়াও থানে জেলার একটা বড়ো অংশ রয়েছে।

"মূলত শিল্পের অবস্থানের কারণেই শহরগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। বিরাট বাজার, পুঁজির সহজলভ্যতা তথা উদ্যোগ গ্রহণ ও কারিগরি দক্ষতার কারণেই এখানে শিল্প গড়ে উঠছে, বিশেষত, বাজার-কেন্দ্রিক ভোগ্যপণ্য শিল্প। এছাড়াও, যে শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সামগ্রীর ব্যবহার হয় (যেমন বৈদ্যুতিন, সরঞ্জাম, প্লাস্টিক) সেগুলিরও অতি দ্রুত বিকাশ ঘটছে।"

মেট্রোপলিটান এলাকা

এই সমস্ত ক্ষেত্রে শহরের বাহ্যিক কাঠামোর পরিকল্পনার ইউনিট হিসাবে যে 'অঞ্চল'-কে ধরা হয় তাকেই 'মেট্রোপলিটান এলাকা' বলা যেতে পারে। এর মধ্যে মূল শহরের সঙ্গে থাকে সংলগ্ন শহরতলি তথা গ্রামীণ এলাকা। শহরগুলি ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে হতে শহরতলি এলাকায় ঢুকে পড়ছে এবং বিকাশের অবশ্যম্ভাবী শর্ত মেনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। কেননা আবাসন, শিল্প, বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা, পরিবহণ ও যোগাযোগ তথা বিনোদনের সুযোগ-সুবিধাগুলি গড়ে তুলতে জমির প্রয়োজন দেখা দেবে। শহরগুলিকে বাহ্যিক কাঠামোর পরিকল্পনার রচনার জন্য সবার আগে 'মেট্রোপলিটান এলাকা'-কে চিহ্নিত করতে হবে। জমির ব্যবহার, যেমন, শহরের বিভিন্ন কাজে জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করাই এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। মেট্রোপলিটান এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থানের ধরন নির্ধারণ হয়ে থাকে এই পরিকল্পনায়। সেইসঙ্গে এই মেট্রপলিটান অঞ্চল একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইউনিট হিসাবে কীভাবে কাজ করবে তাও এই পরিকল্পনায় নির্ধারণ করা হয় এবং তা করা হয় মূলত জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

নগরোন্নয়নে পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমিকা

মেট্রোপলিটান এলাকাকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি শহরের পরিকল্পনার স্বার্থে পার্শ্ববর্তী এলাকা (পেরিফেরিয়াল রিজিয়ন) ও পশ্চাদ্‌ভূমি বা হিন্টারল্যান্ড, এই দু'টি এলাকাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা দরকার। মেট্রোপলিটান এলাকার বাইরে যে এলাকা রয়েছে তাকেই পার্শ্ববর্তী এলাকা (পেরিফেরিয়াল রিজিয়ন) বলা হয়। এগুলি মূলত গ্রামীণ বা মফঃস্বল এলাকা হলেও এগুলির ওপর শহরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ভীষণভাবেই রয়েছে। শহরগুলির অর্থনীতির সঙ্গে এই সমস্ত এলাকার অর্থনৈতিক জীবনের অঙ্গাঙ্গী যোগ। কারণ মেট্রোপলিটান এলাকাতেই যাবতীয় শিল্প ও পরিষেবা কেন্দ্রেই মূলত এইসব এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। অন্যদিকে,

এইসব এলাকার কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের ফলে উৎপাদিত সামগ্রী দুধ ও শাক-সবজি, মাংস, পোল্ট্রি ও অন্যান্য পচনশীল কৃষিজ পণ্যের সরবরাহ হয় শহরে। দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল নয়, বরং, শহরের প্রভবেই এইসব এলাকার মানুষের মানসিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু এই পার্শ্ববর্তী এলাকার সীমানার ব্যাপারটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। শিল্প এবং সড়ক, রেল, বিমানবন্দর ইত্যাদির মতো পরিষেবার যখনই সম্প্রসারণ ঘটবে তখনই এই সীমানা বদলে যাবে। মেট্রোপলিটনের সীমানা যত সম্প্রসারিত হবে ততই এইসব পার্শ্ববর্তী এলাকা তার মধ্যে ঢুকে যাবে। যেসব জায়গায় দ্রুত বিকাশশীল বিভিন্ন বড়ো ও ছোটো শহর (টাউন) পাশাপাশি রয়েছে সেখানে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিও এর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে 'মেগালোপলিস' তৈরি করবে।

কিন্তু শহরের পরিকল্পনা রচনার জন্য সঠিকভাবে এই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির সীমানা নির্ধারণ জরুরি। কারণ এই সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমেই মেট্রোপলিটান অঞ্চলের বাইরে সেইসব এলাকাকে চিহ্নিত করা যাবে যেগুলির ওপর শহরের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে জমি ব্যবহারের প্রবণতার ওপর আগামী দিনে শহরের বিকাশ নির্ভর করছে। এই জমি ব্যবহারের মতো বিষয়গুলির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে এবং সেগুলিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শহরে যাতে সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করতে গেলে এই পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এই কারণেই এই নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এই বিষয়টির কথা মাথায় রেখেই সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার গ্রেটার বম্বের বাইরের এলাকার জন্য একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরিতে হাত দিয়েছে। শহরগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোপলিটান এলাকাগুলিতে ফাঁকা জমি নিঃশেষ হয়ে আসছে। এই কারণেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য জমির চাহিদা বাড়ছে। পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে জমির ব্যবহার করলে তার অনেক বিপদ দেখা দেবে। যেমন শুধুমাত্র প্রধান সড়ক ও রেল লাইন বরাবরই বিকাশ ঘটবে (যাকে বলা হয় রিবন ডেভেলপমেন্ট)। অন্যদিকে শিল্পগুলির বিকাশ ঘটবে খাপছাড়াভাবে। সেইসঙ্গে এই এলাকায় দূষিত পদার্থ উৎপাদনের শিল্প গড়ে উঠবে যেগুলিকে পরে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। ইঁটভাটাগুলি একটা বড়ো অংশের উৎপাদনশীল জমিকে গ্রাস করে নেবে। জমি নিয়ে ফাটকা কারবার হবে।

আরও একটি কারণে পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমির ব্যবহারে রাশ টানা দরকার। এই এলাকার অনেক অংশেই নিবিড় কৃষিকাজের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। সেখানে দামি কিন্তু পচনশীল কৃষিপণ্য উৎপাদন করে শহরে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে গ্রামের মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান যেমন বাড়বে তেমনই শহরের বাসিন্দারাও সস্তায় এই সমস্ত কৃষিপণ্য হাতের কাছে পাবেন। এই এলাকার খুব বেশি জমি যাতে কৃষি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করাটা খুব জরুরি।

"আগামী দিনের পরিকল্পনায় শহরগুলির এই আঞ্চলিক ভূমিকাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কোনও ছোটো বা বড়ো শহরের বাহ্যিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনায় শুধু সংশ্লিষ্ট পুরসভার আওতাভুক্ত এলাকাকেই ধরলে চলবে না, বরং, বৃহত্তর মেট্রোপলিটান এলাকাকেই ইউনিট হিসাবে ধরতে হবে। শহরগুলির সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও পশ্চাদ্‌ভূমির পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে এই সম্পর্ককে কাজে লাগানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট শহরের পরিকল্পনায়।"

পশ্চাদ্‌ভূমির ধারণা

শহরের পশ্চাদ্‌ভূমি বা হিন্টারল্যান্ড বলতে সেই অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে যাবতীয় বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা আসে শহর থেকে। বম্বে দেশের একটি প্রধান বন্দর। পুরো মহারাষ্ট্র, গুজরাট-সহ দেশের পশ্চিম অংশ এবং মাইসোর, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের কিছু অংশের মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হল এই শহর। একইভাবে দিল্লিও পুরো উত্তর-পশ্চিম ভারতের মূল বাণিজ্য ও পরিষেবা কেন্দ্র। প্রতি শহরের পরিকল্পনার সময় এই শহরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে কী অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছে তা বিশ্লেষণ করাটা খুব জরুরি। কারণ একমাত্র তাহলেই বোঝা যাবে আগামী দিনে শহরগুলির ওপর কী চাপ আসতে চলেছে। বম্বের মতো শহরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটলে তথা খনিজ সম্পদের উৎপাদন বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই এই বন্দর ও এই শহরে ঢোকার সড়ক ও রেলপথের ওপর চাপ বাড়বে। এর ফলে ব্যাঙ্কিং, বিমা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিষেবার চাহিদা বাড়বে। তার ওপর শিল্পের সম্প্রসারণে যদি পেট্রোলিয়ামের মতো আমদানিকৃত জ্বালানি লাগে বা এই শিল্পের যদি আরও বড়ো মাপের রপ্তানির পরিকল্পনা থাকে তা হলে এই ব্যাঙ্কিং বা বিমা পরিষেবার চাহিদা আরও বাড়বে।

ছোটো শহরগুলি বড়ো শহরের 'উপনদী'

একটি বড়ো মেট্রোপলিটানকে তার পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে ছোটো ছোটো বিভিন্ন শহর। উপনদীগুলির সঙ্গে একটা বড়ো নদীর যা সম্পর্ক, একটি বড়ো শহরের সঙ্গে ছোটো ছোটো শহরগুলিরও তাই সম্পর্ক। পশ্চিম ভারতের বেশিরভাগ শহরের সঙ্গে বম্বের সম্পর্কও তাই। এই শহরগুলির প্রত্যেকটির আবার

নিজস্ব আরও উপনদী রয়েছে যেগুলো আরও ছোটো ছোটো শহরে পৌঁছছে এবং এই ছোটো ছোটো শহরগুলি থেকে আবার বিভিন্ন পরিষেবা গ্রামগুলিতে পৌঁছচ্ছে। আবার এই ছোটো ছোটো শহরগুলির মাধ্যমেই বড়ো শহরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পশ্চাদ্‌ভূমিতে পৌঁছে যাচ্ছে। পশ্চাদ্‌ভূমির পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে ছোটো শহরগুলি যে ভূমিকা পালন করে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেসব শহরে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব সেখানে যদি তা গড়ে তোলা যায় তাহলে মেট্রোপলিটান শহর বা তার আশেপাশের এলাকার ওপর চাপ কমবে। অন্যদিকে, পশ্চাদ্‌ভূমিতে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলেও শহরের ওপর চাপ কমে। কলকাতা ও বম্বের মতো বড়ো শহরের ওপর চাপ কমাতে এখন অনেকেই পশ্চাদ্‌ভূমিতে এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেন।

পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে ছোটো ও বড়ো শহরগুলি ভূমিকা

শহরগুলি পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিষেবা প্রদানকারীর ভূমিকা নিতে পারে এবং এই কথাখানা ছোটো ছোটো শহরগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই ধরনের শহরগুলির বিকাশ যে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের আর্থিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া, আধুনিকীকরণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় এই শহরগুলি গ্রামাঞ্চলের বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা পেতে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই শহরগুলিতেই ভিড় করেন। শহরগুলি থেকেই নতুন নতুন ধ্যানধারণা, প্রক্রিয়া ও কারিগরি জ্ঞান গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এই শহরগুলিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই ‘গ্রামীণ পরিষেবা কেন্দ্র’ বলা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই ধরনের ছোটো শহরগুলির গুরুত্ব বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরের পরিষেবাগুলিকে কাজে লাগাতে এগিয়ে আসছে। ১০-২০ বছর আগেও তারা এই পরিষেবা এতটা ব্যবহার করেননি। তাদের মধ্যে শিক্ষার যত প্রসার ঘটবে, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার গ্রহণযোগ্যতা যত বাড়বে এবং কৃষিকাজ যখন আরও বাণিজ্যিক হয়ে পড়বে তখন তারা আরও বেশি করে শহরের পরিষেবাগুলি নিতে এগিয়ে আসবেন। কৃষিক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আসছে তার দরুন পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ এই ধরনের পরিবর্তন বাস্তবায়িত করতে যে সুযোগসুবিধাগুলি প্রয়োজন তা প্রত্যেক গ্রামে গড়ে তোলা যাবে না। যেমন, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সিমেন্ট ও ডিজেল বিতরণ কেন্দ্র বা কৃষি সরঞ্জাম সারাই করার কারখানা—এগুলি কোনও ছোটো শহর বা বড়ো গ্রামেই গড়ে তোলা যায়। তেমনই এই ধরনের শহরগুলিতেই কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বা কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য শিল্প (যেমন কৃষি সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্প) গড়ে তোলা যেতে পারে। কারণ, এখানে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত, এখানে দক্ষ শ্রমিকের জোগান রয়েছে. গ্রামাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যত উন্নতি হবে ততই তাদের মধ্যে জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তরের মতো অপেক্ষাকৃত বড়ো শহর বা বড়ো মাণ্ডিগুলিতে যে উন্নত পরিষেবাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়বে। যেমন, গ্রামের মানুষ আরও বেশি করে শহরে অবস্থিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইবেন।

পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে ছোটো ও মাঝারি মাপের শহরগুলি যে ভূমিকা পালন করে তার প্রশংসা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট শহরগুলির পরিকল্পনায়। সেইসঙ্গে শহরগুলি যাতে এই ভূমিকা পালন করে যেতে পারে পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই শহরগুলির উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভা ও গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটা দু’পক্ষেরই কাজে লাগবে। জেলা স্তরেই সবচেয়ে ভালো করে এই যোগাযোগ গড়ে তোলা যেতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই অনেক রাজ্যে জেলাপরিষদ ও পুরসভাগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, লক্ষ্যে আরও অনেকদূর এগোতে হবে।

আগামী দিনের পরিকল্পনায় শহরগুলির এই আঞ্চলিক ভূমিকাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কোনও ছোটো বা বড়ো শহরের বাহ্যিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনায় শুধু সংশ্লিষ্ট পুরসভার আওতাভুক্ত এলাকাকেই ধরলে চলবে না, বরং, বৃহত্তর মেট্রোপলিটান এলাকাকেই ইউনিট হিসাবে ধরতে হবে। শহরগুলির সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও পশ্চাদ্‌ভূমির পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে এই সম্পর্ককে কাজে লাগানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট শহরের পরিকল্পনায়। শহরগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থিক বিকাশকে একটা দিশা দিতে এবং শহরের অভ্যন্তরের ও তার পশ্চাদ্‌ভূমির বিকাশের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা জরুরি। যে সমস্ত এলাকায় বৃহৎ ও সম্প্রসারণশীল শহরের পাশেই যদি ছোটো শহরগুলি থাকে তা হলে শহরগুলির জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনার পাশাপাশি পুরো অঞ্চলের জন্য একটা অভিন্ন পরিকল্পনা করা যাবে। শহরগুলির পৃথক পরিকল্পনার চেয়ে এই আঞ্চলিক পরিকল্পনা নমনীয় হতে পারে, তাতে অত বিশদ বিবরণ নাও থাকতে পারে, কিন্তু তাতে পুরো এলাকার উন্নয়ন ও এই অঞ্চলের অবস্থিত শহরগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের একটা দিশা অবশ্যই থাকতে হবে। আশেপাশের গ্রামগুলির পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে ছোটো ও মাঝারি মাপের শহরগুলি যে ভূমিকা পালন করে তাকেও উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে হবে। কারণ এই ছোটো শহরগুলিই গ্রামীণ ভারতের আধুনিকীকরণের মাধ্যম। তাই শহর তথা গ্রামাঞ্চলের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতেই এই স্বীকৃতির প্রয়োজন।❑

অম্রুতের মাধ্যমে শহরে পরিকাঠামো গঠন

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

দেশের শহরগুলিতে জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও আর্থনীতিক বিকাশের সুযোগসুবিধে কাজে লাগাতে ভারত সরকার অম্রুত (অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন) চালাচ্ছে। এই উদ্যোগ মারফত শহরের ভোল বদলে দেওয়ার অভিযান এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভারতে শহরের লোকসংখ্যা বেদম বাড়ছে। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেকটস রিপোর্ট ২০১৮ বলছে ভারতের ৩৪ শতাংশ মানুষ বাস করে শহর এলাকায়। ২০১১ সালের তুলনায় শহরে লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ। ২০৩১ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বাড়বে আরও ৬ শতাংশ। ২০৫১ সালে শহরে বাস করবে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ। লোকসংখ্যার এহেন বৃদ্ধি জল সরবরাহ, জঞ্জাল সাফাই (স্যানিটেশন), বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌল পরিকাঠামো পরিষেবাকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাবে। এখন, দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৬৫ শতাংশ শহরের অবদান। ২০৩০ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭০ শতাংশ (ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০১০)। এই পটভূমিতে, আর্থনীতিক বিকাশের সত্যিকারের ইঞ্জিন হয়ে উঠতে পর্যাপ্ত নাগরিক পরিষেবা জুগিয়ে শহরগুলিকে মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে সক্ষম করতে মৌল পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

গত পাঁচ বছরে ভারত সরকার এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে। এর সুবাদে মৌল পরিষেবায় উন্নতি হয়েছে উল্লেখযোগ্য। চ্যালেঞ্জ অবশ্য রয়েই গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১১-র জনগণনার প্রতিবেদন অনুসারে শহরের ৭০ শতাংশ পরিবার জল সরবরাহের নাগাল পেলেও, মাত্র ৪৯ শতাংশ পরিবার তাদের বাড়িতে জল পায়। এছাড়া, প্রক্রিয়াকরণের পর্যাপ্ত ক্ষমতার অভাব এবং অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত না থাকায় ৬৫ শতাংশ বর্জ্য জল ঢালা হয় খোলা নর্দমায়। ক্ষতি হয় পরিবেশের এবং খালবিল-নদীনালা-পুকুর দূষিত হয়ে পড়ে (কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ, ২০১৫)। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (২০১১)-এর ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন কর্মসূচির হিসেব, ভারতে অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার দরুন ২০০৬ সালে ক্ষতি ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। যা কিনা, এদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৬.৪ শতাংশের সমতুল। টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ (বিশেষ করে টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.১ এবং ৬.৩)[১] অর্জনের জন্য, নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া ও বর্জ্য জলের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকরণ

ভারত সরকার গত পাঁচ বছরে এসব ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে মৌল পরিষেবায় ঘটেছে অনেক উন্নতি। বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পার্ক ও সবুজ জায়গার মতো মৌল পরিষেবার বন্দোবস্ত করতে দেশের ৫০০-টি শহরে অম্রুত চালু হয়।

[লেখক আবাসন ও শহর বিষয়ক সচিব, ভারত সরকার। ই-মেল : secyurban@nic.in]

জরুরি। সেইসঙ্গে সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা নিষ্কাশন করাও আবশ্যক।

উপরের কথা বিবেচনা করে বলতে হয় যে শুধুমাত্র শহরে জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি নয়, এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগগুলি কাজে লাগানোর জন্যও ভারত সরকার অম্রুত শুরু করে।

আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রকের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি অম্রুত-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। কর্মসূচিটি চালু হয় দেশের ৫০০-টি শহরে। সব বাড়িতে জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি, সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা নিষ্কাশন, হেঁটে বা সাইকেলে যাতায়াতের বন্দোবস্ত এবং সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পার্ক ও সবুজ জায়গার ব্যবস্থা করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এতে সকলের, বিশেষত গরিব এবং সুযোগবঞ্চিত মানুষদের জীবনের মানের উন্নতি হবে। কেন্দ্র পোষিত এই কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৫০ হাজার কোটি টাকা।

মৌল পরিকাঠামো গড়ে তোলা ছাড়াও, এই মিশনে আছে এক সংস্কার অ্যাজেন্ডা। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এগারটি বিষয়ে ৫৪-টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে।

এসব সংস্কারের মধ্যে পড়ে নাগরিকদের জন্য অনলাইন পরিষেবা, যাবতীয় মঞ্জুরি বা অনুমোদনের জন্য এক জানলা (সিঙ্গল উইনডো) ব্যবস্থা গড়া, পুর ক্যাডার (municipal cadre) গঠন, নিদেন নব্বই শতাংশ বিল ও করের টাকা আদায়, শিশুদের জন্য বছরে অন্তত একটি পার্ক তৈরি, পার্ক এবং খেলার মাঠের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত, পুরসভার ক্রেডিট রেটিং এবং পুর বন্ড ছাড়া, বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রবর্তিত আইন রূপায়ণ এবং জল ও শক্তির অডিট।

কর্মসূচির আওতায় পড়ে

(১) ২০১১ সেনসাস অনুযায়ী এক লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যার ৪৭৬-টি নগর ও শহর;

(২) (১)-এর আওতা-বহির্ভূত রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী;

(৩) হৃদয় (Heritage City Development and Augmentation Yojana—HRIDAY) প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যবাহী শহরগুলি;

(৪) প্রধান নদীগুলির তীরে অবস্থিত এবং পাহাড়ি রাজ্য/দ্বীপ এবং পর্যটকদের গন্তব্য কিছু শহর।

সব মিলিয়ে ৫০০-টি শহর পড়ে এই প্রকল্পের আওতায়।

বরাদ্দ তহবিল

● অম্রুতের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। এর মধ্যে কেন্দ্রের দেয় অংশ ৫০ হাজার কোটি টাকা। বাদবাকিটা দেবে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। মোট বরাদ্দ থেকে ৭৭,৬৪০ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প খাতে। কেন্দ্রের দেওয়া টাকার ১০ শতাংশ প্রশাসন ও অফিস খরচ বাবদ এবং আর ১০ শতাংশ সংস্কারে প্রণোদনা (ইনসেনটিভ)-এর জন্য।

● কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রকল্পগুলির পুরো তহবিলই কেন্দ্র জোগায়। উত্তর-পূর্ব এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলির ৯০ শতাংশ প্রকল্প ব্যয় বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যান্য রাজ্যের বেলায়, ১০ লক্ষের বেশি বাসিন্দার শহরে প্রকল্প ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং বাকি শহরগুলিতে প্রকল্প ব্যয়ের অর্ধেক ভাগ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

● কেন্দ্র ২০ : ৪০ : ৪০ এই অনুপাতে তিন কিস্তিতে টাকা ছাড়ে। রাজ্যের বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যান অনুমোদনের পর পরই মেলে প্রথম কিস্তির টাকা। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, রিভিউ অ্যান্ড মনিটরিং এজেন্সির রিপোর্ট পেলে এবং রাজ্য/পুরসভা তাদের ভাগের টাকা দিলে পরের কিস্তির টাকা ছাড়া হয়।

অম্রুত : ভারতে শহরায়নের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলা

সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীকতা : সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের অম্রুত শহরের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আগেকার জওহরলাল নেহরু শহর পুনর্গঠন মিশনে (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission—JNURM) প্রকল্প মঞ্জুর করত তখনকার শহরোন্নয়ন মন্ত্রক।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য কাঠামো : শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং প্রশাসনের উন্নতির লক্ষ্যে অম্রুত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে খুব জোর দিয়েছে। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা বাড়ানো ও পরিষেবা আরও

ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া। সংস্কার কাঠামোর ফর্মুলা রাজ্য এবং অম্রুত শহরগুলির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধি ও অগ্রাধিকারের তত্ত্ব : নাগরিকদের জন্য আরও উন্নত স্যানিটেশন এবং সব বাড়িতে জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে অম্রুতে বৃদ্ধির তত্ত্ব প্রবর্তন করা হয়েছে। ধাপে ধাপে এই লক্ষ্যপূরণ করা হবে। জল এবং স্যানিটেশনের জরুরি চাহিদা

বুঝে, রাজ্যগুলিকে জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পে গুরুত্ব দিতে হবে, জলের জোগান হচ্ছে প্রথম অগ্রাধিকার।

দণ্ড নয় প্রণোদনা বা উৎসাহে জোর : আগেকার জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশনে সংস্কার সম্পূর্ণ না হলে প্রকল্প বাবদ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার ১০ শতাংশ আটকে রাখা হ'ত। এর দরুন সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই ১০ শতাংশ বরাদ্দ হারাত; কেননা

কেউই ১০০ শতাংশ সংস্কারের লক্ষ্যপূরণ করতে পারত না। টাকার ঘাটতিতে অনেক প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ থাকত। রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত

এবং গঠনমূলকভাবে তাদের উদ্যোগকে পুরস্কৃত করতে, আম্বুতে সংস্কার রূপায়ণকে প্রণোদনা জোগান হয়; বাজেট বরাদ্দের ১০ শতাংশ নির্দিষ্ট করা থাকে সংস্কারের জন্য ইনসেনটিভ বাবদ এবং তা প্রকল্প খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত। ২০১৫-'১৬-তে ইনসেনটিভ দেওয়া হয় ৪০০ কোটি টাকা। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ এবং ২০১৮-'১৯-এ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ইনসেনটিভ পায় যথাক্রমে ৩৪০ কোটি টাকা ও ৪১৮ কোটি টাকা। ইনসেনটিভের এই টাকা অম্বুতে স্বীকৃত যেকোনও কাজকর্মে খরচ করা যায়। রাজ্য এবং শহরের স্বশাসিত সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে নিজেরা কোনও টাকা নাও দিতে পারে।

মিশনের কাজকর্মে নজরদারি : কর্মসূচি রূপায়ণে অগ্রগতি এবং ফাঁকফোকর বোঝার জন্য বিভিন্ন স্তরে নজর রাখা হয়। রাজ্য স্তরে আছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিয়ারিং কমিটি। মুখ্যসচিব-এর প্রধান। কমিটি মিশন

প্রকল্পগুলি অনুমোদন করে এবং প্রকল্পের কাজে নজর রাখে। কেন্দ্রীয় স্তরে আছে শীর্ষ বা অ্যাপেক্স কমিটি। আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রকের সচিবের নেতৃত্বাধীন এই কমিটির কাজ হল রাজ্যের বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যান মঞ্জুর করা এবং তার অগ্রগতি খতিয়ে দেখা। জিও-ট্যাগিং-সহ Mission MIS Dashboard মারফত রিয়াল-টাইমের ভিত্তিতে সব প্রকল্পের সাফল্য এবং গলতিতে নজরদারিও চলে। এছাড়া, জেলা স্তরীয় আঞ্চলিক পর্যালোচনা ও নজরদারি কমিটি (District Level Regional Review and Monitoring Committee—DLRMC) প্রকল্পগুলি বিশদভাবে খুঁটিয়ে দেখে। ইনস্টিটিউট অব রুরাল ম্যানেজমেন্ট (IRMA) তৃতীয় পক্ষ হিসেবে প্রতিটি রাজ্যে মিশনের অগ্রগতিতে নজর রাখে।

রেখাচিত্র-১
অম্বুতে ক্ষেত্রগত বরাদ্দ

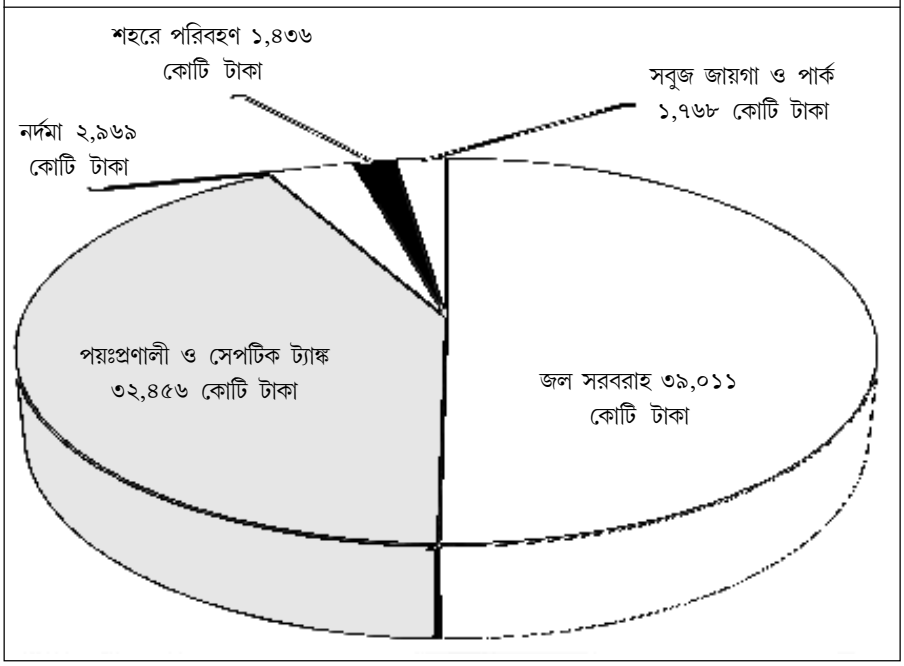

এযাবৎ অগ্রগতি

আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক প্রথম তিন বছরে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ৭৭,৬০০ কোটি টাকার বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যান মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে, ৩৯,০১১ কোটি টাকা (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ) বরাদ্দ হয়েছে জল সরবরাহ খাতে। পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা সাফাই প্রকল্পে বরাদ্দের অঙ্ক ৩২,৪৫৬ কোটি টাকা (৪২ শতাংশ)। ভারী বৃষ্টির দরুন জমা জল সরানোর প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে ২,৯৬৯ কোটি টাকা (৪ শতাংশ), ১,৪৩৬ কোটি টাকা সাইকেল বা হেঁটে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে। পার্ক ও সবুজ জায়গার জন্য বরাদ্দ ১,৭৬৮ কোটি টাকা (২ শতাংশ)।

অনুমোদিত ৭৭,৬৪০ কোটি টাকার পরিকল্পনার মধ্যে ৭০,৯৬৯ কোটি টাকার ৫,২৩০-টি প্রকল্পের বরাত দেওয়া হয়েছে। ৬,৪৬৯ কোটি টাকার ২,১১১-টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ। বাদবাকির কাজ চলছে। এছাড়া, ১০,৯৪৫ কোটি টাকা মূল্যের দরপত্র বা টেন্ডারের প্রক্রিয়া চলছে।

২০১১-র সেনসাস মাফিক, ৫০০-টি মিশন শহরে মোট ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ পরিবার (৬৪ শতাংশ) নলবাহিত জল (tap water) পায়। অম্বুতে ৩৯,০১১ কোটি টাকা বিনিয়োগের দরুন ২০১৯ সালের আগস্ট অবধি ৬০ লক্ষ পরিবার ট্যাপ ওয়াটার পেয়েছে। চলতি প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হলে আরও ৭৯ লক্ষ পরিবার নলবাহিত জল পাবে।

অনুরূপভাবে পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত বাড়ানোর জন্য অম্বুতে ৩২,৪৫৬ কোটি টাকা লগ্নি করে কাজ চলছে। ২০১৯ সালে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল ৩১ শতাংশ পরিবারের জন্য। মিশনের মেয়াদ শেষে তা ৬২ শতাংশে পৌঁছে যাবে। এযাবৎ, আরও ৬০ লক্ষ পরিবারের কাছে পয়ঃপ্রণালীর সুযোগ পৌঁছে গেছে। মিশনের আওতায় আরও ১ কোটি ৫ লক্ষ পরিবার এর সুবিধে পাবে।

এছাড়া, অম্বুত পার্ক ও খোলা সবুজ জায়গার জন্য শহরগুলিকে সাহায্য করেছে।

রূপায়ণে অগ্রগতি এবং ফাঁকফোকর বোঝার জন্য বিভিন্ন স্তরে কর্মসূচিতে নজর রাখা হয়। দিও-ট্যাগিং-সহ Mission MIS Dashboard মারফত রিয়াল-টাইমের ভিত্তিতে সব প্রকল্পের সাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে নজরদারি চলে।

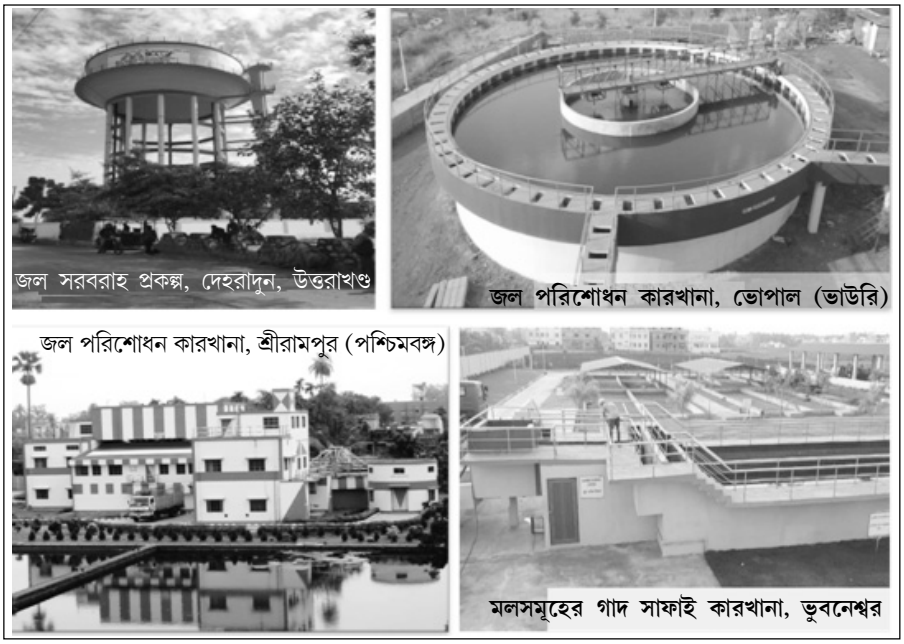

স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানো এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তৈরি হয়েছে ফুটপাত, ওয়াকওয়ে, স্কাইওয়াক ইত্যাদি ইত্যাদি।

শহর সংস্কার

● **কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার :**

বাড়ি তৈরির জন্য অনলাইন অনুমতির ব্যবস্থা (Online Building Permission System—OBPS) : সহজে নির্মাণের অনুমতি পেতে বাড়ি তৈরির জন্য অনলাইন অনুমতির ব্যবস্থা দিল্লি এবং মুম্বাইতে চালু হয়েছে ২০১৬-র এপ্রিলে। এর ফলে, নির্মাণ পারমিটে ব্যবসা সহজ করার তালিকায় ভারত গত ৩ বছরে ১৫৮ ধাপ উঠে এসেছে। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবসা করার প্রতিবেদনে (World Bank Doing Business Report—DBT) ভারত ২০২০ সালে ২৭ নম্বরে। ২০১৭ সালে ছিল ১৮৫ নম্বর স্থানে (রেখাচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

২০২০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশের সব শহরে অনলাইন বিল্ডিং পারমিশন সিস্টেম (OBPS) চালু করার লক্ষ্য আছে। এ পর্যন্ত, এটা রূপায়িত হয়েছে ১,৮৩২-টি শহরে। এর মধ্যে অম্নুত শহর ৪৪০-টি। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, দাদরা এবং নগর হাভেলি, দিল্লি, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা এবং ত্রিপুরা এই ১৩-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই অনলাইন ব্যবস্থা কাজ করছে সব ক'টি পুরসভায়।

রাস্তায় এলইডি বাতি : রাস্তাঘাটে ৬৫ লক্ষ প্রচলিত বাতি বদলে জ্বালানি সাশ্রয়ী এলইডি বাতি লাগানো হয়েছে। এতে বছরে বিদ্যুৎ বাঁচছে ১৩৯ কোটি কিলোওয়াট এবং কার্বন নির্গমণ কমেছে বার্ষিক ১১ লক্ষ টন (রেখাচিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)।

ক্রেডিট রেটিং : মোট ৪৮৫-টি অম্নুত শহরের মধ্যে ৪৬৯-টির ক্রেডিট রেটিং হয়েছে। বাদবাকির কাজ চলছে। ১৬৩-টি শহরে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এর মধ্যে ৩৬-টি শহর পেয়েছে 'এ' বা তার চেয়ে উঁচু রেটিং। নিচু রেটিং পাওয়া শহরগুলি

রেখাচিত্র-২
নির্মাণ পারমিটে ব্যবসা সহজ করা
(বিশ্ব ব্যাঙ্ক)

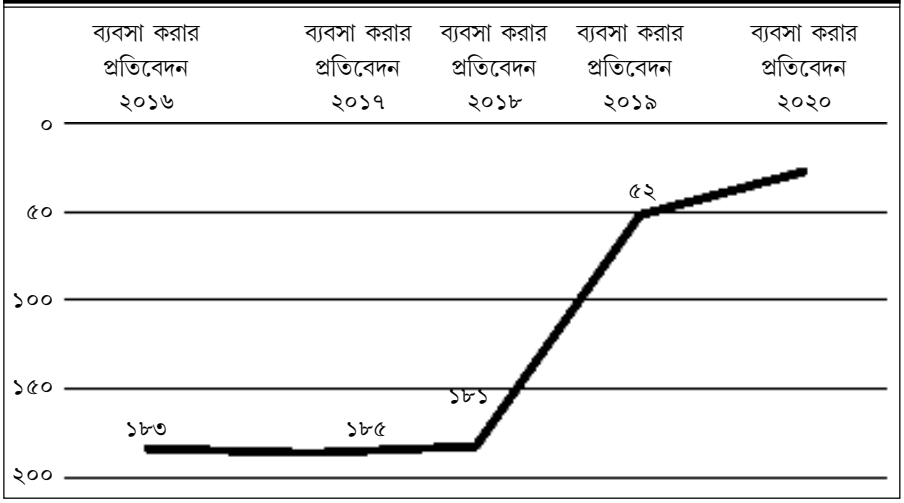

রেখাচিত্র-৩
রাস্তায় এলইডি বাতি

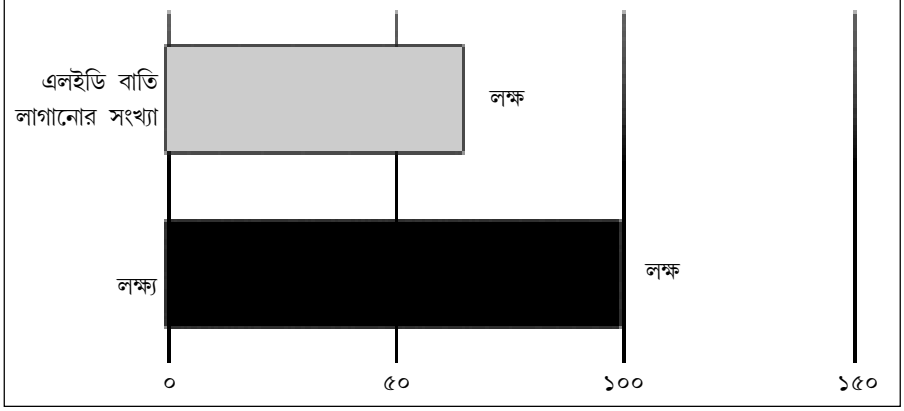

রেখাচিত্র-৪
ক্রেডিট রেটিং-এর কাজ

তাদের পারফরম্যান্সে উন্নতি ঘটিয়ে ঋণ পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য বেশকিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে (রেখাচিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)।

পুর বন্ড (Municipal Bonds) : আটটি মিশন শহর (আমেদাবাদ, অমরাবতী[২], ভোপাল, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, পুনে, সুরাত এবং বিশাখাপত্তনম) পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০১৭-'১৯-এ পুর বন্ড মারফত ৩,৩৯০ কোটি টাকা তুলেছে। ১০০ কোটি টাকার বন্ড বিক্রি হলে, মন্ত্রক ১৩ কোটি টাকা দেয় ইনসেনটিভ হিসেবে। ইনসেনটিভের সর্বোচ্চ সীমা শহরপিছু ২০০ কোটি টাকা। সোজা কথায়, এর মানে হল বন্ডের জন্য দেয় সুদের ২ শতাংশ পাওয়া যায় মন্ত্রক থেকে। আটটি শহরের বন্ড বিক্রির জন্য ১৮১ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে। বন্ড বাজারে ছেড়ে টাকা তুললে পুর সংস্থার প্রশাসন, হিসাব ব্যবস্থা, রাজস্ব, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং পরিষেবা জোগানে উন্নতি হবে। লক্ষ্য আছে আগামী ৪ বছরে অন্তত ৫০-টি শহর বন্ড ছাড়বে। এর ফলে নাগরিকদের সেবায় পুরসভাগুলির স্বনির্ভরতা এবং আস্থা বাড়বে।

আরও দক্ষ করে তোলার জন্য ৫২,৬৭৩ জন পুরকর্মীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জল শক্তি অভিযান : শহর

জলের টানাটানি এক জাতীয় সমস্যা। এর সমাধানকল্পে, কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক ২০১৯ সালের পয়লা জুলাই জল শক্তি অভিযান শুরু করে। এই অভিযানের লক্ষ্য হল : জল সংরক্ষণ, জল শোধন, জলাশয় এবং ভূগর্ভে জল স্তর বৃদ্ধি ও বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার। দেশের ৭৫৪-টি জলঘাটতি-যুক্ত শহরে মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে জল সংরক্ষণকে এক জন-আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য, আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রক রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/ পুরসভাগুলির সঙ্গে জল শক্তি অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

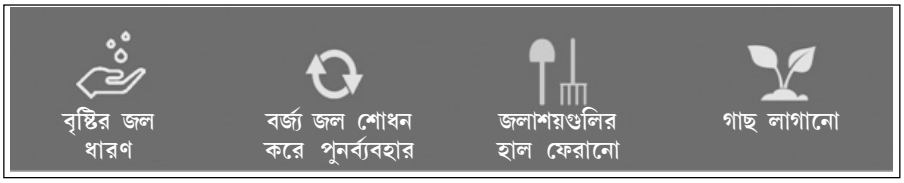

এই অভিযানের দু'টি পর্ব। প্রথমটি পয়লা জুলাই, ২০১৯ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্বটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ অবধি সেইসব রাজ্যের জন্য যেখানে মৌসুমি বায়ু সরে যাওয়ার সময় বৃষ্টি হয়।

জল শক্তি অভিযান (শহর) জোর দিয়েছে :

(ক) **বৃষ্টির জল ধরে রাখায় :** ভূগর্ভে জল স্তর পূরণ এবং জল জমিয়ে রাখতে, পুরসভাগুলি রেনওয়াটার হারভেস্টিং সেল, রেনওয়াটার হারভেস্টিং স্ট্রাকচার তৈরি ও বসানোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

(খ) **বর্জ্য জল পরিশোধন করে ফের ব্যবহার :** পুরসভাগুলি সরকারি ভবনে ডুয়াল পাইপিং স্ট্রাকচার তৈরি করেছে। বর্জ্য জল শোধন করে হর্টিকালচার, গাড়ি ধোয়ামোছা, হাইড্রান্ট ইত্যাদির জন্য ফের ব্যবহার করতেও তারা উদ্যোগ নিয়েছে।

(গ) **জলাশয়ের হাল ফেরানো :** পতিত কুঁয়ো এবং জলাশয় সংস্কার করতে পুরসভাগুলি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

জল শক্তি অভিযানে অগ্রগতি

৫২,৩৪৪-টি নতুন রেনওয়াটার হারভেস্টিং স্ট্রাকচার

১,৩৭২-টি জলাশয় সংস্কার

জন-আন্দোলনে অংশ নিয়েছে ৩.৩ কোটির বেশি মানুষ

পোঁতা হয়েছে ৬.৭ লাখের বেশি চারাগাছ

বর্জ্য জল শোধন করে ৪০,০৯৯-টি সংস্থা কাজে লাগাচ্ছে

(ঘ) **গাছ পোঁতা :** পুর প্রতিষ্ঠানগুলি শহরে গাছের চারা লাগাতে স্থানীয় মানুষকে জড় করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে।

আরও এগোনোর পথ

শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের উন্নতিতে, অম্রুত উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মিশনের মেয়াদকালে অম্রুত ৫০০-টি শহরে ৬০ শতাংশের বেশি মানুষের বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা গাদ সাফাইয়ের পরিষেবা পৌঁছে দেবে। তবে, ৪,৩৭৮-টি শহরের মধ্যে সাড়ে তিন হাজারের বেশি অপেক্ষাকৃত ছোটো শহরে এখন জল সরবরাহ, সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা গাদ সাফাইয়ের জন্য কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প নেই। সবার জন্য জল এবং স্যানিটেশনের টেঁকসই ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী উন্নয়নের ৬ নম্বর লক্ষ্যটি এবং প্রধানমন্ত্রী অমূল্য জল সংরক্ষণ এবং জল বুঝেশুনে ব্যবহার করতে প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশনের ঘোষণা মাথায় রেখে ১১৫-টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার বিশেষ চাহিদা মেটাতে গুরুত্ব দিতে হবে। এই মিশনের কর্মকাণ্ড ছোটো শহরগুলিতে সম্প্রসারণ করা জরুরি।❑

পাদটীকা :

(১) টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.১ নিরাপদ পানীয় জল দেওয়ার দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছে এবং ৬.৩ বলেছে, ''২০৩০ সালের মধ্যে দূষণ কমিয়ে, জঞ্জাল অপসারণ এবং বিপজ্জনক ও অন্য বস্তু ছড়ানো ন্যূনতম করে, বর্জ্য জল অনুপাত অর্ধেক নামিয়ে এবং বিশ্বে রিসাইক্লিং ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার বাড়িয়ে জলের মান উন্নত করতে হবে।

(২) অমরাবতীর ক্ষেত্রে, ইনসেনটিভ দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজধানী অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (Andhra Pradesh Capital Region Development Authority); কেননা এই সংস্থাটি সেখানে স্থানীয় পুরসভার কাজ করছে।

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

ভারতের বস্তি অঞ্চল : ভ্রান্তধারণা বনাম বাস্তব

অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ

বস্তিগুলির অবস্থা অনেকটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। এখানে বসবাসকারী পরিবার ও সমগ্র এলাকা, উভয়ের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। ১৫ বছরের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিতে অনেক এলাকার উন্নতি ঘটেছে। এখন আর সেগুলিকে বস্তি বলা যায় না। দেখা যাচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু এলাকার অনেক ইতিবাচক বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে। আবার বহু এলাকায় অবস্থার অবনতি হয়েছে।

বস্তি এলাকার জন্যই আধুনিক শহরগুলির সৌন্দর্যহানি ঘটছে এমন একটা ধারণা ভীষণ-ভাবেই প্রচলিত। বাস্তবে এই বস্তিগুলি কিন্তু বড়ো শহরগুলির মধ্যেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। এই বস্তিগুলি থেকে যা পরিষেবা পাওয়া যায়, তার জোরেই বহু শিল্প ও গৃহস্থালী টিঁকে থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি দৃষ্টিতে বস্তিগুলির শ্রেণিবিভাগ করা হয়। তাই বস্তিগুলির জন্য একটি অভিন্ন নীতি গ্রহণ করাটা কখনই উচিত নয়। কারণ তাতে শুধু সম্পদেরই অপব্যবহার হবে। বস্তি সম্বন্ধে নানা বাস্তব তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি যে ভুল ধারণাগুলি চালু রয়েছে তা এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল; যাতে বস্তির মতো বিষমসত্ত্ব ও জটিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বহুমুখী নীতি গ্রহণ করা যায়।

বেঙ্গালুরু, জয়পুর ও পাটনা, ভারতের এই তিনটি শহরের ২৭৯-টি বস্তিকে নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বস্তিগুলির ১০ হাজার পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়ে যে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই এই নিবন্ধ লেখা হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ছ'দফায় মৌলিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তার মধ্যে ২০১০, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫ সালে চার দফার সমীক্ষা চালানো হয়েছে বেঙ্গালুরুতে এবং ২০১৬ সালে বাকি দু'-দফার সমীক্ষা হয়েছে জয়পুর ও পাটনায়। গত ১৫ বছরের সময়কালে এক-একটি বস্তির উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ, মৌখিক সাক্ষ্য সংগ্রহ, জনগোষ্ঠীর প্রধান ও সম্পত্তির দালালদের সাক্ষাৎকার নিয়ে এবং প্রত্যেক শহরে বিভিন্ন বস্তি থেকে এলোমেলোভাবে বাছাই করা (র‍্যান্ডম সিলেকশন) কয়েক হাজার পরিবারের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমাদের এই পরীক্ষানিরীক্ষায় বিভিন্ন তথ্য ও ভুল ধারণার কথা উঠে এসেছে। আমরা এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব তথ্য ও প্রচলিত তিনটি ভুল ধারণার বিষয়ে আলোচনা করব।

☐ **বাস্তব চিত্র :** সরকারি তালিকায় বস্তিগুলিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা হয় না এবং বস্তিবাসীদের সংখ্যাকে কম করে দেখানো হয়।

উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সরকারি নথিতে যে সমস্ত বস্তির উল্লেখ নেই সেগুলিতে জীবনযাপনের মান সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত বস্তিগুলির তুলনায় নিম্নমানের। সরকারি নথিতে 'ব্লু পলিগ্নন' ধরনের বসতির কোনও উল্লেখ নেই। 'ব্লু পলিগ্নন' মানে সেই শ্রেণির বস্তি যেখানে ঘরের বদলে রয়েছে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর একটা নীল প্লাস্টিকের আচ্ছাদন। উপগ্রহ চিত্রে এগুলিকে নীল আয়তক্ষেত্রের মতো দেখতে লাগে।

[লেখক আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি নীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এডগার টি. থমসন অধ্যাপক। ই-মেল : ak30@duke.edu]

চিত্র-১
বস্তিগুলির ক্রমবিন্যাস ও বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রাপ্ত স্কোর

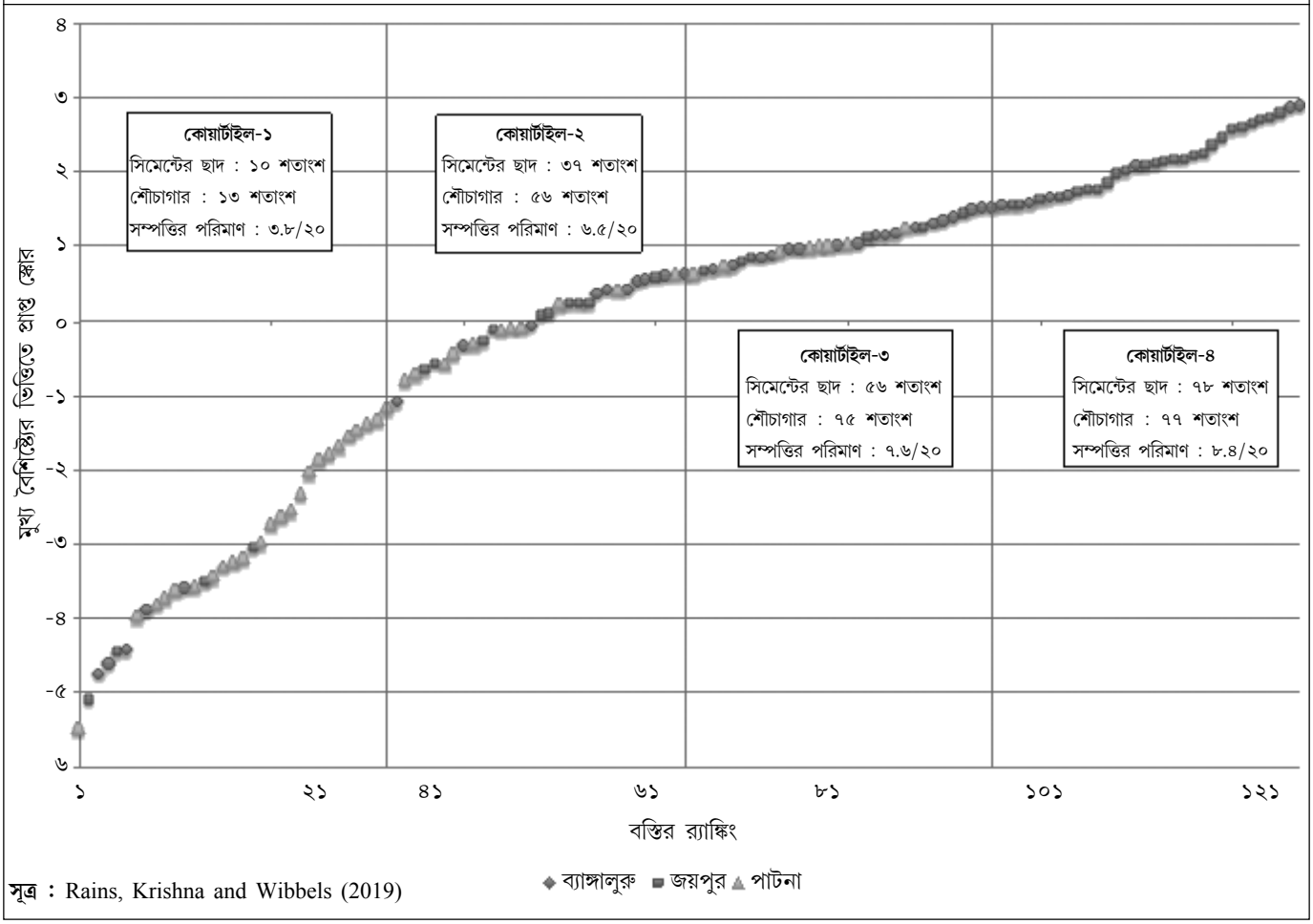

সূত্র : Rains, Krishna and Wibbels (2019)

পূর্ববর্তী সমতীক্ষার সূত্র ধরে কর্ণাটক বস্তি উন্নয়ন পর্ষদের (KSDB) কাছ থেকে বস্তিগুলির একটি তালিকা নিয়ে ২০১০ সালে আমি প্রথম সমীক্ষাটি চালাই। সরকারি এই তালিকা থেকে এলোমেলোভাবে (র‍্যান্ডম) ১৪-টি বস্তিকে বেছে নিই। এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া ১,৪৮১-টি পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাই যে, সরকারি তালিকায় যে বস্তিগুলি রয়েছে, সেগুলিতে হতদরিদ্র মানুষ যত না বাস করছেন তার চেয়ে বেশি রয়েছে প্রতিষ্ঠিত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এখানে স্থায়ী বহুতল কাঠামো রয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই টিভি সেট, প্রেসার কুকার, বৈদ্যুতিক পাখা রয়েছে। দেখা গেছে শহরের গড় দারিদ্র্যের তুলনায় এখানে দারিদ্র্যের হার কম (কৃষ্ণ, ২০১৩)। তবে শহরে আরও অনেক বস্তি রয়েছে যেগুলির উল্লেখ সরকারি তালিকায় নেই। সেখানে জীবনযাপনের মান একদম আলাদা।

সরকারি এই তালিকা অসম্পূর্ণ। সরকারি সংস্থাগুলি এই সবে বস্তিবাসীদের সংখ্যা গণনা শুরু করেছে। ২০০১ সালের জনগণনায় প্রথম বারের মতো হাতে গোনা কিছু শহরের বস্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের সমস্ত শহরে এই ধরনের যে সমস্ত জনবসতি রয়েছে সেগুলিকে প্রথম ২০১১ সালের জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি সংস্থা ভেদে বস্তির সংজ্ঞা ও জনগণনার পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এই সংস্থাগুলি প্রতিটির মধ্যেই বস্তির জনসংখ্যাকে কম করে দেখানোর একটা প্রবণতা রয়েছে। বস্তির এক ধরনের সংজ্ঞার ভিত্তিতে জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণ সংস্থা ২০০৮ সালে মোট বস্তিবাসীর সংখ্যা গণনা করেছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। আবার অন্য একটি সংজ্ঞা ধরে (যা কিনা আংশিক) ২০১১ সালে সেনসাস অফ ইন্ডিয়া বস্তিবাসীর সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বস্তি সম্পর্কিত সর্বোচ্চ সংস্থা ইউএন-হ্যাবিটাট ২০১৪ সালে এদেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা গণনা করেছিল ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। গবেষকরা বিভিন্ন শহরে স্বাধীনভাবে কাজ করে বস্তিবাসীদের যে সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন তার সঙ্গে এই সংখ্যাটা অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ।[১]

নীল ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া (বা কালো বা ছাই রঙা ত্রিপল, আবার পাটনায় দেখা যায় খড়ের চালা) এই ধরনের বসতিগুলিকেই শহরের সবচেয়ে নিম্নমানের বস্তি এলাকা বলা যেতে পারে।

চিত্র-২
বস্তি কন্টিনাম বরাবর অবস্থার পার্থক্য

শহরে এখন এই ধরনেরই বস্তি দেখা যাচ্ছে বেশি। এই ধরনের একেকটা ৭ × ৭ ফুটের কাঠামোতে তিন থেকে পাঁচ সদস্যের পরিবারের বাস। এগুলি তো রয়েছেই, এছাড়াও, অন্যান্য যে সমস্ত বস্তি এলাকায় জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত খারাপ সেগুলির উল্লেখও সরকারি নথিতে নেই।

এই সমস্ত এলাকা বা অন্যান্য দরিদ্র জনবসতিগুলিকে আদমশুমারি বা অন্যান্য সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত না করে বস্তি এলাকার একটা গ্রহণযোগ্য ছবি পেশ করতে চায় সরকার। কিন্তু বাস্তব বলে অন্য কথা।[২] আবার অনেক রাজ্যের সরকারি রিপোর্টে বস্তির কোনও উল্লেখই থাকে না, যা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

☐ ***বাস্তব চিত্র :*** *প্রত্যেক শহরের বস্তিগুলিতে জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন মান রয়েছে যা একটি সরলরেখার (কন্টিনাম) মধ্যে অবস্থান করে। এই সরলরেখা বা কন্টিনামের বিভিন্ন বিন্দুতে মানুষের চাহিদা ভিন্ন। তাই বস্তিগুলির জন্য একটি অভিন্ন নীতি কার্যকর হতে পারে না।*

বস্তিগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য ইউ এন---হ্যাবিটাট (ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটলমেন্ট প্রোগ্রাম) পাঁচটি মাপকাঠি পেশ করেছে। বস্তি এলাকার পরিবারগুলিতে সাধারণত জীবনযাপনের যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকে না সেগুলির ভিত্তিতেই এই মাপকাঠিগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন, বাড়িগুলির স্থায়ী এবং টেঁকসই কাঠামো, বসবাসের পর্যাপ্ত স্থান, পানীয় জল ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা এবং বসবাসের স্থায়িত্ব। পারিবারিক ও এলাকাভিত্তিক যে তথ্য আমরা পেয়েছি তার ওপরেই এই মাপকাঠিগুলিকে আমরা কাজে লাগিয়েছি। প্রতিটি মাপকাঠির জন্য আলাদা আলাদাভাবে যে নম্বরগুলি দিয়েছি সেগুলিকে যোগ করে প্রতিটি বস্তি এলাকার জন্য এক-একটা মোট নম্বর স্থির করেছি। এই বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে চিত্র-১-এ। এখানে বস্তিগুলির অবস্থানের সরলরেখা বা কন্টিনামকে চারটি কোয়ার্টাইলে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিটি শহরের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের বস্তি এলাকা থাকে। বেঙ্গালুরু ও জয়পুরের বস্তিগুলি এই সরলরেখা বা কন্টিনামের উপরের স্তরে অবস্থান করলেও প্রতিটি শহরেই এমন অনেক বস্তি থাকে, যেখানে জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলি পর্যন্ত নেই। এই ধরনের বস্তিগুলিই সাধারণত সরকারি নথি থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যায়।

বেঙ্গালুরুর বস্তিগুলির অবস্থানের সরলরেখার (কন্টিনাম) যথাক্রমে নিচে, মাঝে ও একদম উপরে যে বস্তিগুলি অবস্থান করছে সেগুলির ছবি দেওয়া হয়েছে চিত্র-২ নং-এ। এই সমস্ত জনবসতিই বস্তির সংজ্ঞার মধ্যে পড়লেও সেগুলি একে-অপরের চেয়ে একদম আলাদা।

বস্তিগুলির অবস্থানের সরলরেখা বরাবর জীবনযাপনের পরিবেশও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই সরলরেখার একেবারে নিচের কোয়ার্টাইলে অবস্থানকারী পরিবারগুলির মোট খরচের ৫৯ শতাংশই খাদ্যের পেছনে। অন্যদিকে, একেবারে ওপরের কোয়ার্টাইলে অবস্থানকারী পরিবারগুলিতে খাদ্যের জন্য ৪৭ শতাংশ খরচ হয়। এছাড়া স্তরভেদে পেশা, আয় ও শিক্ষাগত মানের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

বস্তি কন্টিনামের বিভিন্ন বিন্দুতে বসবাসকারী পরিবারগুলির চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তারা যে সরকারি পরিষেবাগুলি চান সেগুলির মধ্যেও পার্থক্য থাকে। যেমন, সবচেয়ে নিচের কোয়ার্টাইলে যে বস্তিগুলি রয়েছে সেখানে পানীয় জল (২৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে), আবাসন (২৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে), শৌচাগার (২৫ শতাংশের মতে)-এর মতো পরিষেবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আবার সবচেয়ে উপরের কোয়ার্টাইলে অবস্থানকারী বস্তি এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৩০ শতাংশের মতে) ও কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণের (১৪ শতাংশের মতে) প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

তাই বস্তিগুলির জন্য কোনও একটি অভিন্ন নীতি কখনই কার্যকরী হতে পারে না। এতে সহায়সম্পদের অপচয় হয়। তাই কন্টিনামের কোন বিন্দুতে সংশ্লিষ্ট বস্তিটি অবস্থান করছে তা জানাটা খুব জরুরি। তাহলেই সরকারি সহায়সম্পদের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা যাবে।

☐ ***বাস্তব চিত্র :*** *বস্তি এলাকাগুলিতে দ্রুত যেসব পরিবর্তন ঘটছে প্রথাগত সমীক্ষায় তা ধরা পড়ে না। একমাত্র উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্রের ভিত্তিতেই বস্তিগুলির মানচিত্র তৈরি করা যায় এবং সেই অনুসারে বস্তিগুলির শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব।*

চিত্র-৩-এ দেখুন। বেঙ্গালুরুর একটা বস্তি এলাকায় গত দশ বছরে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে। ২০০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে এক-একটা বস্তির কী কী পরিবর্তন হয়েছে উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি দেখে তার তুলনা করা যেতে পারে। এই ছবিগুলি বিশ্লেষণ

চিত্র-৩
সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবর্তন, আশ্রয়নগর, বেঙ্গালুরু

২০০৪—ফাঁকা জমি ২০০৭—নীল ত্রিপলের কাঠামো ২০১৪—মাঝারি মানের বস্তি

করলে দেখা যাবে যে নতুন নতুন বস্তি গড়ে উঠেছে, পুরনো অনেক বস্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, বস্তি এলাকার মধ্যে নতুন নতুন ঘরবাড়ি গড়ে ওঠার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বস্তির সীমানা বদলে গেছে, বস্তির ভেতরকার রাস্তাগুলির দিক পরিবর্তন হয়েছে, আবার অনেক নতুন নতুন ল্যান্ডমার্ক যোগ হয়েছে। একটি শহর জুড়ে একইসঙ্গে শত শত বস্তির যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে পুরসভা বা নগর উন্নয়ন পর্ষদগুলির আদ্যিকালের সমীক্ষার পদ্ধতি কাজে লাগবে না। এই কারণেই সরকারি নথিগুলি যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই অন্যদিকে এগুলি সময়োপযোগী নয়।

উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবির বিশ্লেষণ করলে এই সমস্যার একটা প্রতিকার হতে পারে। প্রাথমিকভাবে বস্তিগুলি শনাক্তকরণ তথা আরও অনেক কাজের ক্ষেত্রে মোটামুটি চলনসই গোছের ছবি (coarser-grained images) হলেই চলবে। গুগল আর্থে বিনামূল্যে এই ধরনের ছবি পাওয়া যায়। আর, উন্নত মানের ছবি (finer-grained images) চাইলে তার জন্য মূল্য দিতে হবে। করদাতাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সাধারণভাবে পুরসভাগুলি যে অর্থ ব্যয় করে বা তাদের যে ব্যয় করা উচিত তার তুলনায় এই ছবির খরচ একেবারেই নগণ্য।

বিভিন্ন শাখা থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আমাদের গবেষক দল গঠিত হয়েছিল। এই দলে কম্পিউটার বিজ্ঞানী, শহরাঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভূগোলবিদদের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীরাও ছিলেন। উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপগ্রহ চিত্রের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন তারা।[৩] ক্রমাগত ছবি বিশ্লেষণ (যা তত্ত্বাবধান করতেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী, শহরাঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভূগোলবিদরা) এবং হাতে-কলমে তথ্য যাচাইয়ের (যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমাজবিজ্ঞানীরা) মাধ্যমে আমরা আধা-স্বয়ংক্রিয়ভাবে বস্তি চিহ্নিতকরণ ও বস্তিগুলির শ্রেণিবিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটোকল ও অ্যালগরিদম তৈরি করেছিলাম। হাতে ধরে ধরে এই চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবিভাগের কাজে যত খরচ হয় তার তুলনায় এই পদ্ধতির খরচ অনেক কম। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে ভুলত্রুটির (কোনও তথ্য বাদ চলে যাওয়া বা অপ্রয়োজনীয় কোনও তথ্য ঢুকে পড়া) সম্ভাবনাও অনেক কম। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং অন্যান্য অনেক দেশেই বস্তিগুলির মানচিত্র তৈরি তথা এইগুলির ওপর সমীক্ষা চালানোর কাজে উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন গবেষকরা। তাছাড়া, নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্যভাবে বস্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও নথির হালনাগাদকরণের জন্যও উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বস্তিগুলির একটা নির্ভরযোগ্য নথি তৈরির কাজে সরকার যদি সত্যিই আন্তরিক হয়ে থাকে, তা হলে উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে অন্য পদ্ধতিগুলিকে যুক্ত করে এই ধরনের একটি অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তার সদ্ব্যবহারে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে।

☐ ***ভ্রান্ত ধারণা :*** *বিভিন্ন মৌলিক পরিষেবা ও বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির স্বত্ব পাওয়ার জন্য সরকারি প্রজ্ঞাপন জরুরি।*

আইনে বলা হয়েছে, যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে সরকারিভাবে বস্তিগুলির প্রজ্ঞাপন হলে তবেই বস্তিবাসীরা পুরসভার বিভিন্ন পরিষেবা ও সম্পত্তির পাট্টা বা স্বত্ব পাবেন। বেঙ্গালুরুর বস্তি আইনে এখানকার বস্তি এলাকাগুলির প্রজ্ঞাপনের পদ্ধতি উল্লিখিত রয়েছে (এই পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে চিত্র-৪-এ)।

আইনে বর্ণিত পদ্ধতি একেবারেই সহজসরল। কিন্তু বাস্তবে প্রজ্ঞাপন জারির প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক ধোঁয়াশা রয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন শহরের প্রজ্ঞাপন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে তিনটি সরকারি সংস্থার হাতে বস্তি এলাকার আলাদা আলাদা তিনটি তালিকা রয়েছে।[৪] আমরা আমাদের তথ্যভাণ্ডার থেকে ৭৫-টি বস্তির র‍্যান্ডম স্যাম্পল নিয়ে এই তিনটি তালিকায় সেগুলির খোঁজ করেছি এবং একটি বস্তি এলাকা প্রজ্ঞাপিত কিনা সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসীদের প্রশ্ন করেছি।

এই কাজ করতে গিয়ে প্রচুর অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছি আমরা। আমাদের বাছাই করা ৭৫-টি বস্তির মধ্যে মাত্র দু'টির উল্লেখ এই তিনটি তালিকাতেই রয়েছে। বাকি ৭৩-টি বস্তির ক্ষেত্রে একটা উদ্ভট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কোনও তালিকায় এগুলি প্রজ্ঞাপিত বস্তি হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে আবার অন্য একটি তালিকা অনুযায়ী এগুলি প্রজ্ঞাপিত নয়।

চিত্র-৪-এ বিভিন্ন সংস্থার এক্তিয়ারের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকার জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তাই কোনটি প্রজ্ঞাপিত বস্তি এবং কোনটি নয় তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। সরকারি নথিতে প্রজ্ঞাপন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে তা নিয়ে বস্তিবাসীদের মাথাব্যথা নেই, বাস্তবে যা হচ্ছে সেটাই তাদের কাছে ভাববার বিষয়।[৫]

বিভিন্ন আইনি বিধান ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আরও অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে KSDB, BBMP (পুর নিগম) ও পূর্বতন গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ১৮-টি আলাদা আলাদা সম্পত্তির নথি বস্তিবাসীদের দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির বিভিন্ন

চিত্র-৪
সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির প্রক্রিয়া (বেঙ্গালুরু)

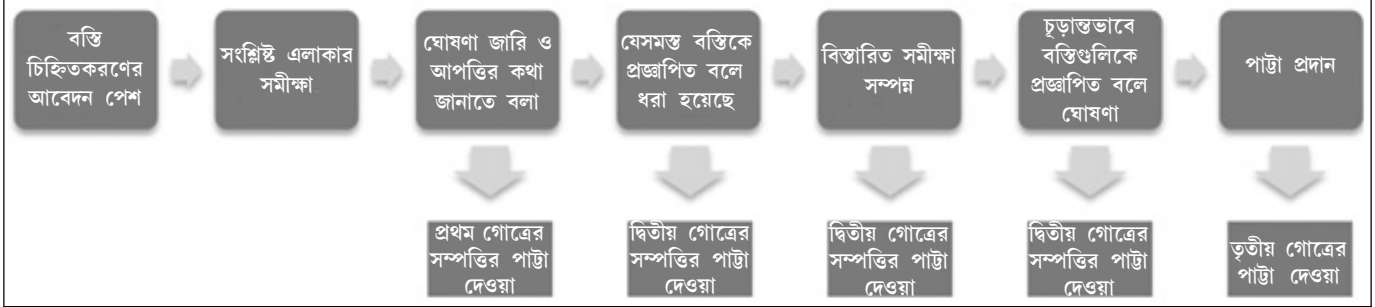

সূত্র : Krishna and Rains (2019)

পর্যায়ে এই কাগজপত্রগুলি দেওয়া হয়েছে (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রত্যেকটি কাগজকে সম্পত্তির পাট্টা বলা যেতে পারে, কিন্তু এই নথিগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেগুলি বৃহত্তর সম্পত্তির স্বত্বের সূচনা করতে পারে। প্রথম গোত্রের কাগজপত্রগুলি (যেমন, বায়োমেট্রিক কার্ড, পরিচয় পত্র, গুরুটিনা চিঠঠি এবং তিলুবালিকে পত্র) দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনের আগে। এই নথির বলে সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসী উত্তরাধিকার সূত্রে বাসস্থানে বসবাসের অধিকার পেলেও এই সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রির অধিকার পান না। প্রজ্ঞাপনের পর দেওয়া দ্বিতীয় গোত্রের নথিপত্রের বলে উক্ত ব্যক্তি শুধু যে বাসস্থানে বসবাসের অধিকার পবেন তাই নয়, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে ১০ বা ৩০ বছর পরে তিনি এই সম্পত্তি বিক্রিও করতে পারবেন। এই ধরনের নথির মধ্যে রয়েছে হাক্কু পত্র, বসবাসের শংসাপত্র, ইজারার দলিল এবং হাঞ্চিকে পত্র। তৃতীয় গোত্রের কাগজপত্রে (বিক্রয়যোগ্য স্বত্ব) স্পষ্টভাবে মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছে, বিশেষত, যখন এই কাগজের সঙ্গে সম্পত্তির কর প্রদানের প্রমাণপত্র থাকে তখন খুব সহজেই মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়। আরেক শ্রেণির বস্তিবাসী রয়েছেন যাদের কাছে কোনও কাগজপত্র থাকে না (টাইপ-০)। বস্তি কন্টিনামের নিচের স্তরেই সাধারণত এর উদাহরণ দেখা যায়। এই ধরনের অনেক বস্তির কোনও নথিই থাকে না। বেঙ্গালুরুতে যে পরিবারগুলিকে আমরা নমুনা হিসাবে নিয়েছি সেগুলির ৩৫ শতাংশের কাছে তৃতীয় গোত্রের, ৪০ শতাংশের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় গোত্রের কাগজপত্রে রয়েছে। আর, ২৬ শতাংশের কাছে সম্পত্তির কোনও কাগজপত্রই নেই।

আইনানুসারে, কোনও বস্তির প্রজ্ঞাপন হলে তবে বাসিন্দাদের হাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোত্রের নথিপত্র আসবে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগে অনেক ফাঁক থেকে যায়। প্রজ্ঞাপন না হওয়া এমন অনেক বস্তি রয়েছে যেখানে বাসিন্দাদের একটা বড়ো অংশের হাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোত্রের নথিপত্র রয়েছে। আবার এমন অনেক বস্তি রয়েছে যেগুলির প্রজ্ঞাপন (অন্ততঃপক্ষে যেকোনও একটি সরকারি তালিকা অনুযায়ী) হলেও সেখানকার বাসিন্দাদের হাতে শুধুমাত্র প্রথম গোত্রের কাগজপত্র রয়েছে।

বস্তি এলাকার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখান থেকে চট করে লোকজনেরা উঠে যান না। যেমন, এখানকার এক-একটা বাড়িতে পরিবারগুলি গড়ে ২১ বছর ধরে বসবাস করে থাকেন। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাই (৬৬ শতাংশ) তিন বা তার বেশি প্রজন্ম ধরে একই বাড়িতে বসবাস করছেন। এই তিনটি শহরের বস্তি কন্টিনাম বরাবর বাইরে থেকে আসা প্রথম প্রজন্মের বাসিন্দা রয়েছেন মাত্র ২৭ শতাংশ। আর এদের মাত্র অর্ধেক এসেছেন গ্রাম থেকে।

একইভাবে, খাতায়-কলমে কোনও বস্তির প্রজ্ঞাপন হলে তবেই সেখানকার বাসিন্দারা বর্জ্য অপসারণ, পাইপলাইন মারফৎ জল সরবরাহ, নিকাশি, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট এবং আলোকিত পথঘাট ইত্যাদি পৌর পরিষেবা পাবেন। সরকারি নথিতে যে স্থানের উল্লেখই নেই সেখানে সরকারি অর্থ ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে প্রজ্ঞাপন না হওয়া অনেক বস্তিতেই বিভিন্ন পৌর পরিষেবা ও পরিকাঠামো রয়েছে যা প্রজ্ঞাপিত অনেক বস্তিতেই নেই। প্রশাসনের এই অবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্মের জন্য দুর্নীতির সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

☐ ***ভ্রান্ত ধারণা : সম্পত্তির পাট্টা না থাকার কারণে বস্তিবাসীরা তাদের সম্পত্তি বন্ধক দিতে বা বিক্রি করতে পারেন না।***

খাতায়-কলমে একমাত্র তৃতীয় গোত্রের কাগজপত্র থাকলে তবেই সম্পত্তি বিক্রি করা যায়। অন্য নথি দেখিয়ে সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রি করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যেকোনও ধরনের কাগজপত্র দেখিয়ে বস্তি অঞ্চলে অবাধে সম্পত্তির লেনদেন চলছে। বেঙ্গালুরুতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদিত হয় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জুড়ে দেওয়া হয়। এরই মাধ্যমে বিক্রেতা ভবিষ্যতের সমস্ত স্বত্ব ক্রেতার হাতে তুলে দেন এবং ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত লেনদেনে কোনও রকম অসুবিধা দেখা দিলে ক্রেতাকে সর্বতোভাবে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এই নথিতে স্বাক্ষর করেন এবং তাদের ছবি ও পরিচয়পত্রও এই

নথির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের সম্পত্তির লেনদেনের সময় সাক্ষী থাকেন, আর অবশ্যই থাকেন উকিল। সম্পত্তির নথিপত্র দিয়ে অনেক সময় কাজ হাসিল হয় না। তখন সরকারি নথির মতো দেখতে একটা নথি তৈরি করে দেওয়া হয়। এই নথি তৈরির জন্য একটা অপ্রথাগত বাজারও রয়েছে। এই ধরনের নথির মাধ্যমে অপ্রথাগত সম্পত্তির কেনাবেচা চলে। বস্তির অবস্থানের সরলরেখা বা কন্টিনাম বরাবর এভাবেই সম্পত্তির লেনদেন চলে। তবে 'ব্লু পলিগণ' এলাকায় এবং যেসমস্ত বসতি নিয়ে আইনি বিবাদ রয়েছে সেখানে অবশ্য সম্পত্তি কেনাবেচার হার কম।

মোটামুটিভাবে যেকোনও বছরে বস্তি এলাকায় ২ শতাংশ সম্পত্তির কেনাবেচা এভাবেই হয়। এই লেনদেনের ওপর কোনও কর দিতে হয় না। ফলে পুরসভার রাজস্ব মার খায়।

☐ ***ভ্রান্ত ধারণা :*** *বস্তিগুলি আসলে মাথা গোঁজার অস্থায়ী ঠিকানা যা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসা মানুষজন ও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে।*

বস্তি এলাকাগুলিতে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের ঘটনাও খুব কম। এদেশের শহরাঞ্চলে ছয় ধরনের কাজের যে শ্রেণিবিভাগ রয়েছে তার ভিত্তিতে বাবা ও ছেলের পেশার মধ্যে তুলনা করে আমরা দেখেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বাবার পেশাই বেছে নিয়েছে ছেলে এবং তারা দু'জনেই রয়েছেন প্রথম শ্রেণির পেশায় (যেমন, নির্মাণক্ষেত্র, দিনমজুরি বা কারখানার কাজ, আবর্জনা সংগ্রহ)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরবর্তী প্রজন্ম আরও উচ্চমানের পেশায় গেছে (২৯ শতাংশ)। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে যে বাবা প্রথম শ্রেণির পেশায় থাকলে ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণির পেশায়, তার বেশি নয়। এই উন্নতি ইতিবাচক হলেও তা ভীষণভাবেই সীমিত। অন্যদিকে, ১৪ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাবা দ্বিতীয় শ্রেণির পেশায় থাকলেও ছেলে গেছে প্রথম শ্রেণির পেশায়।

বস্তিগুলির অবস্থা অনেকটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। এখানে বসবাসকারী পরিবার ও সমগ্র এলাকা, উভয়ের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। ১৫ বছরের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিতে অনেক এলাকার উন্নতি ঘটেছে। এখন আর সেগুলিকে বস্তি বলা যায় না। চিত্র-৩-এ দেখা যাচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু এলাকার অনেক ইতিবাচক বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা মূলত হয়েছে ছাদ তৈরির উপকরণে। খুব অল্পসংখ্যক এলাকায় (১ শতাংশ) একাধিক বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে। আবার বহু এলাকায় অবস্থার অবনতি হয়েছে।

বেশিরভাগ বস্তিবাসী, এমনকি সবচেয়ে উন্নত বস্তিগুলোরও, মূলত অপ্রথাগত ক্ষেত্রেই কাজ করেন। স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য পরিষেবা বা অবসরকালীন সুযোগসুবিধা রয়েছে এমন কাজে উত্তরদাতাদের ৫ শতাংশেরও কম রয়েছেন। বস্তির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস ও অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজের ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে যে ঝুঁকি ও বিপন্নতার বোধ তৈরি হয় তা কমাতে না পারলে তাদের সামনে উন্নততর পেশার পথ উন্মুক্ত হবে না।❑

পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণার সূত্র :

- Krishna, Anirudh.(2013). "Stuck in Place: Investigating Social Mobility in 14 Bangalore Slums." *Journal of Development Studies,* 49(7) : 1010-28.
- Wibbels, Erik, Anirudh Krishna, and M.S. Sriram. (2018). "Satellites, Slums, and Social Networks: Evidence on the Origins and Consequences of Property Rights from 157 Slums in Bengaluru." Working paper, Department of Political Science, Duke University.
- Rains, Emily, Anirudh Krishna, and Erik Wibbels. (2019). "Combining Satellite and Survey Data to Study Indian Slums: Evidence on the Range of Conditions and Implications for Urban Policy." *Environment and Urbanization,* 31(1) : 267-92.
- Krishna, Anirudh and Emily Rains. (2019) "Between Zero and One: a continuum of property rights in slums of Bangalore." Working paper, Sanford School of Public Policy, Duke University.

উল্লেখপঞ্জি :

(১) A government report forthrightly acknowledges these and other lacunae in the official record. See GOI. (2010). Report of the Committee on Slum Statistics/Census. New Delhi: Government of India, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Available at http://mhupa.gov.in/W_new/Slum_Report_NBO.pdf; http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/WHD-2014-Background-Paper.pdf.

(২) Census 2011reports, for instance, that 94 per cent of slum dwellers live in sturdy or semi-sturdy households, but only 72 per cent of our sample live in houses made of bricks, wood, or cement, and the rest live under tarp or in mud or tin huts. The census also estimates that 53 per cent of homes store money in banks, but our sample reports approximately half that number.

(৩) This research team was led by Raju Vatsavai (computer science, North Carolina State University), Nikhil Kaza (urban geographer, University of North Carolina, Chapel Hill) and Erik Wibbels and I (social scientists, Duke University). We are grateful for the grants we received for different parts of this research from Duke University, International Growth Center, and Omidyar Foundation, and DigitalGlobe, for their grant of satellite images.

(৪) Respectively, KSDB (the slum board), BBMP (the municipal corporation), and Aasha Kiran Mahiti (the State Government's department of municipal administration).

(৫) This point is developed by Wibbels, Krishna and Sriram (2018).

মিশন ইন্দ্রধনুষ ২.০ : সার্বিক টিকাকরণের অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে ভারতের অঙ্গীকার

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে ফের একবার নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই দফায় আগামী বছরের, অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চালানো হবে টিকাকরণ অভিযান, যার পোশাকি নাম ***Intensified Mission Indradhanush (IMI) 2.0****। গত দফায় সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি চালানোর সময় যেসব অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছিল, তাকে মাথায় রেখে এগোনো হবে চলতি অভিযানের রূপায়ণ পর্বে। একই সাথে, গোটা দেশজুড়ে অন্তত পক্ষে নব্বই শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন করার যে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, তা পূরণে জোরদার প্রচেষ্টা চালানো হবে। গোটা দেশের ২৭-টি রাজ্যের ২৭১-টি জেলা তথা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের ৬৫২-টি ব্লকজুড়ে এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে; বিশেষ করে দূরদুরান্তের জনবসতি এবং আদিবাসী জনসংখ্যার কাছে পৌঁছাতে।*

দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নিরিখে সর্বোচ্চ মানক অর্জনের লক্ষ্যে ভারত সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সকলকে স্বাস্থ্য পরিষেবার ছত্রছায়ায় আনতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ; আর তারই এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল টিকাকরণ কর্মসূচি। প্রতিষেধকের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধির বোঝা কমাতে তথা শিশুর পরিচর্যায় বিশ্বজনীন মাপকাঠি অর্জনে ভারতের কর্মতৎপরতার এক অটুট হিস্যা এই টিকাকরণ অভিযান। বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে আসা এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সুফল এনে দিয়েছে। সকলের জন্য উচ্চ গুণমানের, বৈষম্যহীন ও খরচে কুলায় এমন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার প্রতি ভারতের এযাবৎকালীন রেখে চলা আস্থাকেও তা সঠিক বলে প্রমাণ করেছে।

১৯৭৮ সালে ভারত সরকার টিকাকরণের এক ব্যাপকতর কর্মসূচি চালু করে; যার পোশাকি নাম ছিল 'Expanded Program for Immunisation'। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে এর নাম বদলে রাখা হয় 'সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি' ('Universal Immunisation Program' বা UIP)। শেষোক্ত কর্মসূচির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল শিশুদের মধ্যে প্রতিষেধকের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার হার তথা মৃত্যুহার কমানো। ভারতের টিকাকরণ কর্মসূচি গোটা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম। বছরে মোটের উপর প্রায় ২৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন শিশু এবং ২৯ মিলিয়ন গর্ভবতী মহিলাকে এই কর্মসূচির আওতায় টিকা প্রদান করা হয়। লাগাতার অগ্রগতি সত্ত্বেও, রুটিন টিকাকরণের পরিসর বাড়ছে ঢিমেতালে। ২০১৫-'১৬ সালের চতুর্থ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা বা National Family Health Survey-4 2015-'16 (NFHS-4) অনুযায়ী, পূর্ণ টিকাকরণের পরিসর স্রেফ ৬২ শতাংশ। দ্রুত নগরায়ণ, যাদের কাছে পৌঁছানো মুশকিল এমন বিপুল সংখ্যক ভ্রাম্যমান ও বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যার কারণে তথা অসচেতন ও সঠিক তথ্য জানেন না এমন জনসংখ্যার তরফে টিকাকরণের চাহিদা তলানিতে বলেই দেশে টিকাকরণের এই হাল।

সুষ্ঠুভাবে টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়ণের দৌলতে প্রতিষেধকের মাধ্যমে প্রতিরোধ-যোগ্য বেশ কিছু মারণব্যাধি নির্মূল করার ক্ষেত্রে ভারত যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গুটি বসন্ত, পোলিও এবং আরও সাম্প্রতিক সময়ে প্রসূতি মা ও নবজাতকের ধনুষ্টঙ্কারের মতো রোগ। বিপুল জনসংখ্যা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যবিধানের বেহাল দশা এবং দুর্গম ভৌগোলিক চরিত্র দেশে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটাতে অণুঘটকের কাজ করে; একই কারণে প্রতিষেধকের নাগাল মেলাও মুশকিল হয়ে পড়ে। এই জাতীয় নাছোর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সরকার কিন্তু হাল ছেড়ে বসে নেই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়া প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছে যেতে বিবিধ কার্যকর রণ-কৌশলকে হাতিয়ার করে চলেছে। মন্ত্রক জনগোষ্ঠীকে শামিল করেছে, অন্যান্য মন্ত্রক তথা অংশীদার সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা নিচ্ছে, এক নিটোল সংগঠিত নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং গণ প্রচারাভিযান ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে এগোচ্ছে।

শৈশাবস্থায় টিকাকরণের নিম্নহারের সমস্যার মোকাবিলায় ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক চালু করে মিশন ইন্দ্রধনুষ। বিবিধ

কার্যকারণবশত রুটিন টিকাকরণ কর্মসূচি থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যাওয়া তথা টিকা নিতে অনাগ্রহী/বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন এই উভয় গোত্রের জনসংখ্যাই ছিল উল্লিখিত কর্মসূচির মূল টার্গেট। এতে শামিল ছিল সেইসব গর্ভবতী মহিলা ও শিশু, যারা নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদেয় টিকাগুলির মধ্যে আদৌ একটিও নেয়নি (left out) অথবা তার মধ্যে এক বা একাধিক টিকা নেয়নি (dropout)। মিশন ইন্দ্রধনুষের প্রথম দু'টি পর্যায়ের সৌজন্যে দেশে পূর্ণ টিকাকরণের পরিসর ৬ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী সূচনা করেন নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচির। টিকাকরণে ঢিমেতালে অগ্রগতির পালে হাওয়া জোগাতে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মপরিকল্পনা। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, ক্রমাগত টিকাকরণের নিম্নহার বজায় রয়েছে এমন চিহ্নিত জেলাসমূহ ও শহুরে এলাকার উপর বিশেষ নজর দিয়ে দেশে পূর্ণ টিকাকরণের পরিসর (Full Immunization Coverage বা FIC) বাড়িয়ে ৯০ শতাংশের উপর নিয়ে যাওয়া। মিশন ইন্দ্রধনুষের ভিতের উপরই নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষের ইট গাঁথা হয়। জনসংখ্যার অত্যন্ত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অংশভাকের কাছে পৌঁছাতে স্বাস্থ্য ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রকে শামিল করে অতিরিক্ত রণকৌশল কাজে লাগানো হয়। নিয়মিত টিকাকরণকে এক জন-আন্দোলনের চেহারা দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ। লক্ষ্য, টিকাকরণ বিষয়ে চালু ভ্রান্ত ধারণার আগল ভেঙে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্যান্য বারোটি মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয়সাধনের বন্দোবস্ত করে দেয়

মন্ত্রিসভার সচিবালয়। জেলার ক্ষেত্রে একটি জেলা কর্মীবাহিনীর (District Task Force) সাহায্যে জেলাশাসক/জেলা সমাহর্তা অংশগ্রহণের দিকটির মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলাস্তরের নিচে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র ও অন্যান্য দপ্তরের ফিল্ড ওয়ার্কারদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার সংস্থান রাখা হয়েছে।

IMI-এর দৌলতে, ভারতের ১৯০-টি নির্বাচিত জেলায় পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রমাণ করেছে চরম ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রমণের আওতায় থাকা শিশুদের প্রতিষেধক টিকাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের একযোগে উদ্যোগী হয়ে অংশগ্রহণ বেশ কাজে আসে। যাই হোক, এই পথে এগিয়ে আরও বেশি সুফল পেতে বেশকিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধন এবং ফিল্ডে কাজের রীতিতে রদবদল ঘটানো জরুরি। বিশেষ করে জনসংযোগের রণকৌশলে। যাবতীয় পর্যায় মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় মোটের উপর ৩ দশমিক ৩৯ কোটি শিশু এবং ৮৭ দশমিক ১৮ লক্ষ গর্ভবতী মহিলা প্রতিষেধক টিকা পেয়েছে। হাজার হাজার গর্ভবতী মহিলা ও শিশুর জীবনযাত্রার গুণমানে ব্যাপক উন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা।

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে ফের একবার নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই দফায় আগামী বছরের, অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চালানো হবে টিকাকরণ অভিযান, যার পোশাকি নাম Intensified Mission Indradhanush (IMI) 2.0। গত দফায় সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি চালানোর সময় যেসব অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছিল, তাকে মাথায় রেখে এগোনো হবে চলতি অভিযানের রূপায়ণ পর্বে। একই সাথে, গোটা দেশজুড়ে অন্ততপক্ষে নব্বই শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন করার যে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল,

উন্নয়নের রূপরেখা

তা পূরণে জোরদার প্রচেষ্টা চালানো হবে। গোটা দেশের ২৭-টি রাজ্যের ২৭১-টি জেলা তথা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের ৬৫২-টি ব্লকজুড়ে এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে; বিশেষ করে দূরদুরান্তের জনবসতি এবং আদিবাসী জনসংখ্যার কাছে পৌঁছাতে। অন্যান্যদের পাশাপাশি নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক, যুবা বিষয়ক মন্ত্রকের মতো একগুচ্ছ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এই মিশনকে দুর্দান্তভাবে সফল করে তুলতে একযোগে এগিয়ে এসেছে। দেশের প্রত্যন্ত সীমানাবাসী মানুষজনের কাছেও যাতে টিকাকরণের সুফল পৌঁছে দেওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের মদত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে এই মন্ত্রকগুলি।

জনসংখ্যার যেসব শ্রেণি এই মিশনের টার্গেট বলে ইতোমধ্যে চিহ্নিত, তাদের সক্রিয় করতে অন্যান্য মন্ত্রক/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় গড়ে তোলা হয়েছে; যাতে করে জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং যুবসমাজকে নিয়ে এই লক্ষ্যে ঘনিষ্ট বৃত্তে ঢুকে কাজ করা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা (NGOs), সুশীল সমাজ সংস্থা (CSOs), জাতীয় পরিষেবা যোজনা (NSS), রাষ্ট্রীয় ক্যাডেট কোর (NCC), নেহেরু যুব কেন্দ্র ইত্যাদি সংগঠনকেও মানুষের মধ্যে টিকাকরণ বিষয়ে সচতেনতা জাগিয়ে তুলতে কাজে লাগানো হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, UNICEF, রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP), IPE Global, Rotary International ইত্যাদি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানও সরকারের উদ্যোগকে মদত জোগাবে। এছাড়া কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন মাফিক নির্বাচিত রাজ্যগুলিতে কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (Technical Support Units বা TSUs) গড়ে তোলা হবে।

নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ ২.০ চালুর মাধ্যমে ভারত পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুমৃত্যুর হার আরও হ্রাস করতে সমর্থ হবে। তথা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য রোগে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নির্মূল করতে 'দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'-য় ধার্য টার্গেট পূরণেও সক্ষম হবে। অতীতের সাফল্যের বুনিয়াদকে ভিত্তি করে, বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমবেত প্রচেষ্টার দৌলতে দেশ তার লক্ষ্যপূরণে নিঃসন্দেহে সাফল্য পাবে; গড়ে উঠবে এক নিরোগ ভারত। এই সফরপথে এক সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে রোগ প্রতিষেধক টিকা। তা দেশের বর্তমান প্রজন্মের রক্ষা কবচ হিসেবে তথা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ-সবল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চাবিকাঠি হিসাবেও কাজ করে চলেছে।❑

সূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

উল্লেখনীয় কিছু বৈশিষ্ট্য

- ❖ নিয়মিত টিকাকরণ দিবস, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদ দিয়ে সাতটি কর্মদিবস ধরে চার রাউন্ড করে টিকাকরণ কর্মকাণ্ড চালানো হবে।
- ❖ মানুষজনের সময় সুযোগ মাফিক টিকাকরণ নির্ঘন্টে রদবদল, ভ্রাম্যমান টিকাকরণ ব্যবস্থার সংস্থান এবং অন্যান্য দপ্তরের সক্রিয় ভাগিদারীর মাধ্যমে টিকাকরণ কর্মকাণ্ড থেকে ফায়দা বাড়ানোর প্রতি জোর।
- ❖ যারা নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আদৌ কোনও প্রতিষেধক নেননি/পাননি, অর্থাৎ left out এবং উল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় টিকা নেওয়া শুরু করে মাঝপথে টিকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, অর্থাৎ dropout তথা টিকা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণকারী পরিবার ও দুর্গম এলাকাবাসী মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর জোর।
- ❖ শহুরে এলাকা, জনসংখ্যার পিছিয়ে পড়া অংশভাক এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে জোর।
- ❖ বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের পারস্পরিক সমন্বয়।
- ❖ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দায়বদ্ধতা বাড়ানো।
- ❖ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত সময়পর্বে চার দফায় নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নির্বাচিত জেলা ও শহুরে এলাকায় টিকাকরণ কর্মকাণ্ড চালানো হবে।
- ❖ উল্লিখিত প্রস্তাবিত চার দফার শেষে, রাজ্যগুলি IMI থেকে প্রাপ্ত সুফল দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে বজায় রাখতে উদ্যোগ নেবে। এজন্য তারা প্রয়োজন মাফিক নিয়মিত টিকাকরণ পরিকল্পনার সঙ্গে IMI সেসন যুক্ত করার মতো উদ্যোগ নিতে পারে। IMI-এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে কি না, তা স্থির করা হবে এক সমীক্ষার মাধ্যমে।

করতারপুর করিডোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

গত ৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে করতারপুর সাহিব করিডোর তথা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট উদ্বোধন করলেন। তার উপস্থিতিতেই সেখান থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল পুণ্যার্থীর প্রথম দল। উদ্বোধনের আগে যাত্রীদের জন্য নির্মিত 'প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং'-এর পাশাপাশি গুরু নানক দেবজীর জীবনগাঁথা বিষয়ক ডিজিটাল প্রদর্শনীটিও ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। রওনা দেওয়ার আগে পুণ্যার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করেন।

ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, করতারপুর সাহিব করিডোর :

ভারতীয় পুণ্যার্থীদের পাকিস্তানে অবস্থিত গুরুদ্বার করতারপুর সাহিব যাওয়ার সুবিধা দিতে গড়া হয়েছে এই ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট। আন্তর্জাতিক সীমান্তে ডেরা বাবা নানক-এর জিরো পয়েন্ট-এ করতারপুর সাহিব করিডোর চালু করার খুঁটিনাটি নিয়ে গত ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। উল্লেখ্য, গুরু নানক দেবজীর ৫৫০তম জন্মবার্ষিকী যথাযথভাবে দেশে ও দুনিয়াজুড়ে উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সেই মর্মে এক সংকল্পে সায় দেয়। এর অঙ্গ হিসেবেই মন্ত্রীসভা ডেরা বাবা নানক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত করতারপুর সাহিব করিডোর নির্মাণ ও বিকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে বছরভর ভারতীয় পুণ্যার্থীরা পাকিস্তানের করতারপুর-স্থিত গুরুদ্বার দরবার সাহিব (যাকে গুরুদ্বার করতারপুর সাহিবও বলা হয়) অনায়াসে যেতে পারেন।

ভারত-পাক চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও পুণ্যার্থীদের জন্য সুযোগসুবিধার মধ্যে অন্যতম :

- অমৃতসর-গুরুদাসপুর হাইওয়ের সঙ্গে ডেরা বাবা নানকের সংযোগ স্থাপনের জন্য ৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ চার-লেনের মহাসড়কের নির্মাণ করা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে;
- ১৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা যুক্ত 'প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং'। বিমানবন্দরের মতোই গোটা ভবনটি শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত, সেখানে রয়েছে ৫০-টি অভিবাসন কাউন্টার, যার মাধ্যমে নিত্যদিন যাতায়াত করতে পারবেন প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী।
- মূল ভবনের মধ্যেই রয়েছে কিওস্ক, শৌচালয়, শিশু পরিচর্যার আলাদা ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রার্থনা সভা ও খাবারদাবারের কাউন্টারের মতো প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাপত্র;
- সিসিটিভি নজরদারি-সহ বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা ও যাত্রীদের উদ্দেশে তথ্যাদি ঘোষণার জন্য 'পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম';
- যেকোনও ধর্মের ভারতীয় নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি এই করিডোর ব্যবহার করতে পারেন;
- ভারতীয় পুণ্যার্থীদের ভিসার প্রয়োজন নেই, বৈধ পাসপোর্ট থাকলেই হবে;
- ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পাসপোর্টের পাশাপাশি 'ওভারসিস সিটিজেন অব ইন্ডিয়া' কার্ড প্রয়োজন।

নিবন্ধীকরণের জন্য পোর্টাল : prakashpurb550.mha.gov.in

সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো

অসমীয়া ভাষায় ‘কোর্টস অব ইন্ডিয়া : পাস্ট টু প্রেসেন্ট’ প্রকাশনা

গত ১০ নভেম্বর গুয়াহাটিতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অসমীয়া ভাষায় প্রকাশন বিভাগের ‘কোর্টস অব ইন্ডিয়া : পাস্ট টু প্রেসেন্ট’ বইটি প্রকাশ করেন। ভারতের আদালত ও আইনি প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধ ও জটিল ইতিহাস সংকলিত আছে এতে। এই বইটিকে ন্যায়ব্যবস্থার স্থাপত্যের আখ্যা দেন বিচারপতি গগৈয়। এতে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়াদের এই বইটি পড়ার জন্য জোর দেন বিচারপতি গগৈ। অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, ভারতের ভাবি প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রী সোনোয়াল ঘোষণা করেন যে বইটি অসমের সবক'টি সরকারি গ্রন্থাগারে রাখা হবে। নিজের ভাষণে বিচারপতি বোবদে এই বইকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন বলে আখ্যা দেন; বইটি অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিও ও প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ইরা যোশীও। এই বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়। এতে দেশের ন্যায়ালয়গুলির বিবর্তনের ইতিহাস ও বিকাশগাঁথা সংকলিত।❑

সূত্র : অল ইন্ডিয়া রেডিও-র প্রতিবেদন (১০ নভেম্বর, ২০১৯)

জানেন কি?

ভারতের নয়া প্রধান বিচারপতি শ্রী শরদ অরবিন্দ বোবদে

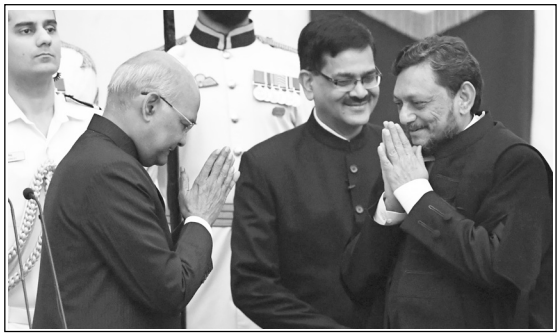

গত ১৮ নভেম্বর। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হল। ভারতের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির সামনে শপথ নিলেন বিচারপতি শ্রী শরদ অরবিন্দ বোবদে।

জন্ম ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল। উকিল হিসেবে আবির্ভাব ১৯৭৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর। প্রথম জীবনে ওকালতি করেছেন মূলত নাগপুরে হাইকোর্ট বেঞ্চ ও জেলা আদালতে; বম্বে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে দেওয়ানী, সাংবিধানিক, শ্রম, কোম্পানি, নির্বাচন ও কর সংক্রান্ত একাধিক মামলাও লড়েছেন।

২০০০ সালের ২৯ মার্চ বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং স্থায়ী বিচারপতি হন ২০০২-এর ২৮ মার্চ থেকে। ২০১২-র ১৬ অক্টোবর থেকে প্রায় ছয় মাসের জন্য মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদে আসীন আছেন।❑

সূত্র : www.nalsa.gov.in; প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো

২১তম উত্তর-পূর্ব বইমেলা

গত ১-১২ নভেম্বর প্রকাশন বিভাগ অংশ নেয় ২০১৯ সালের ২১তম উত্তর-পূর্ব বইমেলায়। আয়োজক নিখিল অসম প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি। অসমের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি। অল ইন্ডিয়া রেডিও ও প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ইরা যোশী স্টল পরিদর্শন করার পাশাপাশি বইয়ের মাধ্যমে অসমের কলা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রসার করার জন্য আয়োজকদের সাধুবাদও জানান।

আমাদের প্রকাশনা

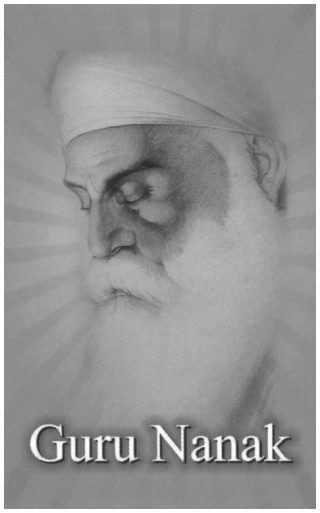

গুরু নানক • লেখক/সংকলক—প্রকাশন বিভাগ

বিবরণ : বিশিষ্ট জ্ঞানীদের দ্বারা রচিত গুরু নানক ও তাঁর বাণী বিষয়ক নিবন্ধের সংকলন।

ISBN-978-81-230-3221-4, PDBN-CLI-ENG-REP-102-2019-20

মূল্য : ১৮৫ টাকা

বিশ্বের অন্যতম নবীন ধর্ম, শিখ ধর্ম। প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকই ছিলেন এই ধর্মের প্রথম গুরু। তাঁর আধ্যাত্মিক বাণীই শিখ ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর। ধর্মীয় উদ্ভাবক হিসেবে সম্মানিত গুরু নানক নিজের বাণী প্রসারিত করার জন্য দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে যাত্রা করেন। তাঁর উপদেশের মূলমন্ত্র এক-ঈশ্বরবাদ; শেখাতেন, যেকোনও মানুষ ধ্যান ও অন্যান্য পুণ্য কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। উল্লেখ্য, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবক্তা ছিলেন না। তাঁর অনুগামীদের তিনি সৎভাবে গার্হস্থ্য জীবনযাপন করার উপদেশ দিতেন। গুরু নানকের ৫০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রথমবার এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এবার তাঁর ৫৫০তম জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত হল এই নয়া সংস্করণটি।

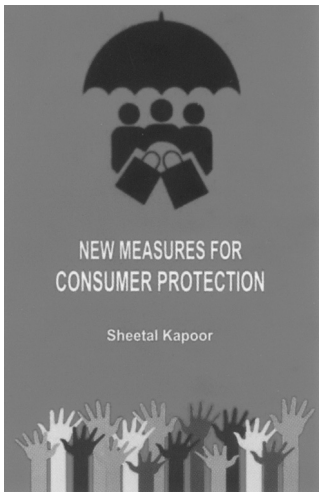

New Measures for Consumer Protection

লেখক : ড. শীতল কাপুর

বিবরণ : ক্রেতা সুরক্ষা তথা গ্রাহকের অধিকার এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

ISBN-978-81-230-3212-4, PDBN-SS-ENG-OP-099-2019-20

মূল্য : ২৭০ টাকা

ভোগবাদ। বাণিজ্য বা অর্থনীতির অন্যতম দিক। কারণ, এই তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বিক্রিবাটা/ব্যবহার বৃদ্ধির চাবিকাঠি। এই শ্রেণিরই সুরক্ষা ও অধিকারের প্রসঙ্গ চর্চার বিষয়বস্তু। বইটির উদ্দেশ্য ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ ও অন্যান্য ভারতীয় নিয়মকানুনের পাশাপাশি বিদেশে প্রচলিত নীতিমালা সম্পর্কে উপভোক্তার সচেতনতা বাড়িয়ে তাদের অধিকারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এর সাহায্যে গ্রাহক বুঝেশুনে ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন; সরবরাহকারীদের শোষণ ও অবৈধ কার্যকলাপও ঠেকানো যাবে। ক্রেতার অধিকার তথা স্বার্থরক্ষাকল্পে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারেও সচেতনতার প্রসারও এই বইটির লক্ষ্য। লেখক ড. শীতল কাপুর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কমলা নেহেরু কলেজে অধ্যাপনা করেন।

যোজনা ? ক্যুইজ

১। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচকে ভারতের স্থান কোথায়?

২। মানবাধিকারের জন্য সাখারভ পুরস্কার কোন সংগঠন দেয়?

৩। ২০১৯ সালের জন্য কোন দুই ক্রিকেটার 'উইসডেন ইন্ডিয়া ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার'-এর খেতাব পান?

৪। পাঠরত পড়ুয়ার সংখ্যার নিরিখে কোন স্কুল 'বিশ্বের বৃহত্তম স্কুল' হিসেবে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী?

৫। গত ১২ বছরে আরব সাগরে প্রথম ঘূর্ণিঝড় (সুপার সাইক্লোন) কোনটি?

৬। সম্প্রতি ভারতীয় রেল মুম্বাইয়ে লোকাল ট্রেনের টিকিট দেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হচ্ছে কোন অপারেটিং সিস্টেম?

৭। বিশ্ব শান্তি স্তূপের ৫০তম বার্ষিকী সম্প্রতি বিহারের কোন জায়গায় উদ্‌যাপিত হয়?

৮। 'ওয়ার্ল্ড ডে ফর অডিও-ভিসুয়াল হেরিটেজ' কোন দিন পালন করা হয়?

৯। থোতলাকণ্ডা বৌদ্ধ মন্দির ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

১০। 'য়ুশু'-র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে কে সোনা জেতেন?

১১। MMGPI কী?

১২। ২০২১ সালে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে ক্লাব-স্তরীয় ফিফা বিশ্বকাপ। কোন দেশে?

১৩। গত ২৩ অক্টোবর 'গ্লোবাল স্নো লেপার্ড অ্যান্ড ইকোসিস্টেম প্রোটেকশান প্রোগ্রাম'-এর শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

১৪। TechSagar কী?

১৫। প্রধানমন্ত্রীর 'ভারত কী লক্ষ্মী' উদ্যোগের অ্যাম্বাসেডর কে?

১৬। 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট' কোথায়?

১৭। গুরু ঘাসিদাস জাতীয় উদ্যান কোন জেলায় অবস্থিত?

১৮। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে অন্তত একজন করে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে মনোনীত করতে হবে—এই মর্মে কোন রাজ্যের মন্ত্রীসভা সায় দিয়েছে?

১৯। '২০১৯ আগা খান আর্কিটেক্চার অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে 'আর্কেডিয়া এডুকেশান প্রোজেক্ট'। এটি কোন দেশের সংস্থা?

২০। "Finding the Gaps"-এর লেখক কে?

২১। অক্সফোর্ড ডিকশনারির ২০১৯ সালের 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' কী?

২২। কোনও ভারতীয় এই প্রথমবার (২০১৯) 'মিস্টার ইউনিভার্স'-এর শিরোপা পেলেন। কে তিনি?

২৩। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকাল রিসার্চ' বাণিজ্য/শিল্পজগতের কোন ব্যক্তিত্বকে সম্প্রতি 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেছে?

২৪। 'অরুণ ভূমি' নামক একটি হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র হালে চালু করেছে কোন রাজ্য?

২৫। 'পিপল ফর এথিকাল ট্রিটমেন্ট অব অ্যানিমালস' (PETA) সংস্থার ভারতীয় শাখা কাকে ২০১৯ সালের জন্য 'পার্সন অব দ্য ইয়ার'-এর আখ্যা দিয়েছে?

উত্তর :

১. ৫৭তম। ২. ইউরোপীয় ইউনিয়ানের পার্লামেন্ট; ২০১৯ সালের বিজেতা ইলহাম তোহতি। ৩. যশপ্রীত বুমরা ও স্মৃতি মন্ধনা। ৪. লখনউ-এর সিটি মন্টেসরি স্কুল। ৫. কিয়ার। ৬. লিনাক্স। ৭. রাজগির। ৮. ২৭ অক্টোবর। ৯. অন্ধ্রপ্রদেশ। ১০. প্রবীণ কুমার। ১১. মেলবোর্ন মার্সার গ্লোবাল পেনশন ইন্ডেক্স; ২০১৯-এ ভারতের স্থান ৩২তম। ১২. চিন; অংশ নেবে ২৪-টি দল। ১৩. দিল্লি। ১৪. ডাটা সিকিউরিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার 'national repository of startups'। ১৫. পি.ভি. সিন্ধু। ১৬. হায়দরাবাদ। ১৭. কোরিয়া, ছত্তিশগড়। ১৮. ছত্তিশগড়। ১৯. বাংলাদেশ। ২০. অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেট আম্পায়ার সাইমন টৌফেল। ২১. 'Climate Emergency'। ২২. কেরালার চিথারেশ নাতেসান। ২৩. কিরণ মজুমদার-শ'। ২৪. অরুণাচলপ্রদেশ। ২৫. বিরাট কোহলি।❑

কার্টোস্যাট-৩

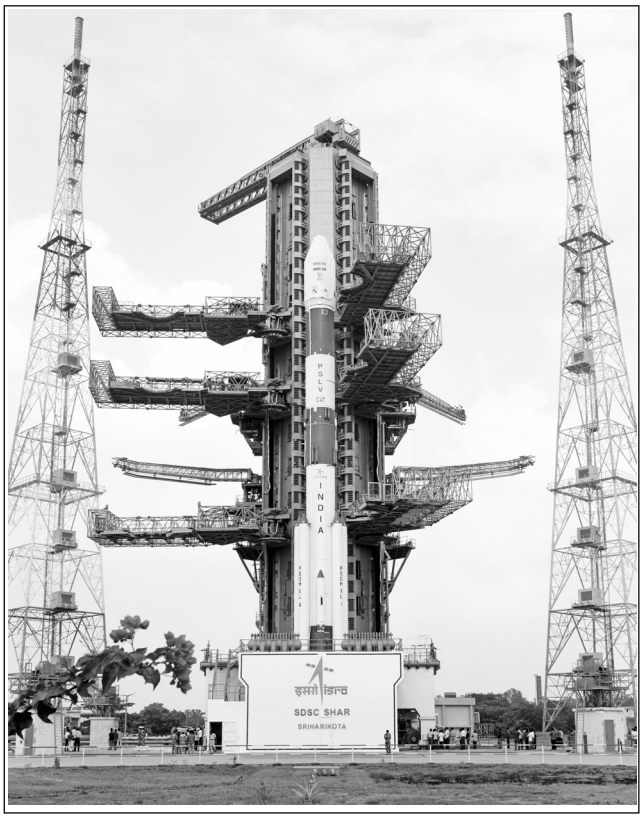

ভূ-পর্যবেক্ষণের উপগ্রহ 'কার্টোস্যাট-৩'-কে কক্ষপথে পাঠালো ইসরো। সঙ্গে পাঠালো আমেরিকার ১৩-টি ন্যানো-স্যাটেলাইট। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় লঞ্চপ্যাড থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী রকেট 'পিএসএলভি-সি৪৭'-এর পিঠে চাপিয়ে গত ২৭ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯-টায় 'কার্টোস্যাট-৩'-সহ ১৪-টি উপগ্রহকে পাঠানো হয়েছে কক্ষপথে। উৎক্ষেপণের ১৭ মিনিট পরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে যায় কার্টোস্যাট-এ। তার পরের ১০ মিনিটে মার্কিন খুদে উপগ্রহগুলিও নিজের নিজের কক্ষপথে পৌঁছয়। কেন্দ্র সরকার ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা হিসেবে নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছে। তার মাধ্যমেই বিদেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বরাত মিলেছে। এই নিয়ে মোট ৪০০-টি বিদেশি উপগ্রহকে কক্ষপথে পাঠালো ইসরো। যা একটি মাইলস্টোন।

উৎক্ষেপণের সময় কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান কে. শিবন। মানচিত্র তৈরির বিদ্যাকে কার্টোগ্রাফি বলা হয়। সেই কাজের সহায়ক উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটকে 'কার্টোস্যাট' নাম দেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে 'কার্টোস্যাট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। তার পরে 'কার্টোস্যাট-২' সিরিজের আরও সাতটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। 'কার্টোস্যাট-৩' তৈরির ক্ষেত্রে আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ইসরোর চেয়ারম্যান কে. শিবন এদিন বলেন, ভূমির উপরে নজরদারির জন্য তৈরি উপগ্রহগুলির মধ্যে 'কার্টোস্যাট-৩' সব থেকে উন্নত মানের।

ইসরো জানিয়েছে, 'কার্টোস্যাট-৩' উপগ্রহে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যামেরা; যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছবি অনেক বেশি স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে তুলতে পারবে। 'কার্টোস্যাট-৩'-কে পাঠানো হয়েছে পৃথিবী থেকে ৫০৯ কিলোমিটার উপরের কক্ষপথে। উপগ্রহটি কক্ষপথে সক্রিয় থাকবে পাঁচ বছর। ইসরোর তরফে এও জানানো হয়েছে, ১৬০০ কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহটি বড়ো মাপের নগরোন্নয়ন প্রকল্পের জন্য খুব কাজে লাগবে। কাজে লাগবে গ্রামীণ সম্পদের অনুসন্ধানেও। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও উপকূল রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও বড়ো ভূমিকা নেবে 'কার্টোস্যাট-৩'।❑

সূত্র : https://www.isro.gov.in/launcher/pslv-c47-cartosat-3-mission

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(নভেম্বর ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

➢ সব থেকে কম বয়সে গ্র্যাজুয়েট হল বেলজিয়ামের লরেন্ট সিমন্স। মাত্র ন'বছর বয়সেই নেদারল্যান্ডের এডিনহোভেন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি পাবে সে। এবছর ডিসেম্বরে শেষ হবে তার গ্র্যাজুয়েশন কোর্স। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, লেরন্টের বুদ্ধাঙ্ক বা আইকিউ ১৪৫। সাধারণত অধিকাংশ মানুষের আইকিউ ৯০ থেকে ১১০-এর মধ্যে হয়। তাই আর পাঁচজনের থেকে লরেন্টের আইকিউ অনেকটাই বেশি। হাই স্কুলের সিলেবাস শেষ করতে লরেন্টের লেগেছিল মাত্র আঠারো মাস।

➢ হংকংয়ে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষায় গত ২১ নভেম্বর বিল পাস হয়ে গেল মর্কিন সেনেটে। সেনেটে পাস হওয়া 'দ্য হংকং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি অ্যাক্ট' নামের এই বিলটি এবার যাবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে। সেখান থেকে পাস হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের টেবিলে।

● **ব্রিকসের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী :**

রাশিয়া এবং চিনের মতো দুই শক্তিধর দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদাভাবে শীর্ষ বৈঠক। আবার ব্রিকসের দেশগুলির সঙ্গে বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জোট গড়ে গড়ো তোলা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানো। এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রাজিলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আলোচনা হয়েছে বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে।

ব্রাজিলে ব্রিকসের মঞ্চেই মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। গত অক্টোবরেই ভারতে এসেছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট। চেন্নাইয়ের কাছে মল্লপুরমে বৈঠক করেন তারা। তার পর ব্রাজিলে ব্রিকসের মঞ্চে ফের সাক্ষাৎ। গত ১৪ অক্টোবর, ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ায়, কথা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ আটকাতে ব্রিকস-এর দেশগুলিকে এক করার চেষ্টা অগ্রাধিকার পায় মোদীর কর্মসূচিতে। ব্রিকস-এর পক্ষ থেকে এব্যাপারে পাঁচটি ছোটো গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের অর্থের জোগান বন্ধ করা, জঙ্গিদের ইন্টারনেট ব্যবহার আটকানো, মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণ, ভিন্ দেশ থেকে আসা জঙ্গি-মোকাবিলার দিকগুলি খতিয়ে দেখবে এগুলি। গত অক্টোবর মাসে ব্রিকসের দেশগুলির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

● **শ্রীলঙ্কায় নয়া প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী :**

শ্রীলঙ্কায় নতুন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের ভাই গোতাবায়া। ভোটগ্রহণ হয় গত ১৬ নভেম্বর। নির্বাচনের ফল বেরোতে দেখা গেল, ৫২.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ৭০ বছরের গোতাবায়া। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিথ প্রেমাদাসা। ৪১.৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে দাদা মাহিন্দা রাজাপক্ষকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানোর কথা ঘোষণা করলেন গোতাবায়া রাজপক্ষ। রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে জানিয়েছেন, পার্লামেন্টে এখনও তার সরকারের গরিষ্ঠতা রয়েছে; তবু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রায়কে মর্যাদা দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রনিল জমানার শেষ পর্বে ছিলেন বিরেধী দলনেতা। মাঝে ২০১৮-র ২৬ অক্টোবর তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপাল সিরিসেনা। মাহিন্দার পরে প্রেসিডেন্ট হন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সিরিসেনা। তিনি মাহিন্দাকে প্রধানমন্ত্রী করেও টিঁকিয়ে রাখতে পারেননি। একাধিক বারের চেষ্টাতেও গরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে পারেননি মাহিন্দা। আবার পদ ছাড়তেও রাজি হননি।

সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট দু'বার স্পষ্ট জানায়, মাহিন্দার 'প্রধানমন্ত্রিত্ব' অবৈধ। সিরিসেনার পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তও অবৈধ। অবশেষে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর 'প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা' দেন মাহিন্দা। ফের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন তিনি। চব্বিশ বছর বয়সে দেশের নবীনতম এমপি হিসেবে পার্লামেন্টে পা রেখেছিলেন ১৯৭০ সালে। ২০০৫-র নভেম্বর থেকে ২০১৫-র জানুয়ারি পর্যন্ত মাহিন্দা ছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট।

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারতকে গোতাবায়া বেছে নিলেন। আর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে ৪৫ কোটি ডলারের ঋণ (সহজ সুদে) ঘোষণা করা হল। এর মধ্যে চল্লিশ কোটি ডলার সেদেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং ৫ কোটি ডলার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

● **বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকা :**

ফোর্বস পত্রিকার বিচারে বিশ্বে ধনকুবেরদের তালিকায় আরও এগোলেন ভারতের মুকেশ অম্বানী। এবার তিনি পিছনে ফেললেন

গুগল-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ এবং সের্গেই ব্রিনকে। মোট ৬০.৫ বিলিয়ন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় ৪,৩৪,১৭,৮২,৫০০ টাকার সম্পত্তির মালিক রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ অম্বানী এখন বিশ্বের নবম বিত্তবান। ফোর্বস তালিকায় দশম ও একাদশ স্থানে আছেন যথাক্রমে ল্যারি পেজ এবং সের্গেই ব্রিন। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ৫ হাজার ৯৬০ কোটি ডলার এবং ৫ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার। ফোর্বসের তালিকার অষ্টম স্থানে আছেন গ্রুপো কার্সোর মালিকা শিল্পপতি কার্লোস স্লিম হেলু এবং তার পরিবার। সপ্তম ধনকুবের এখন ইন্ডিটেক্স ফ্যাশন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা অ্যামান্সিও ওর্তেগা। ওরাক্যল কর্পোরেশনের মালিক ল্যারি এলিসন আছেন এই তালিকার ছ'নম্বরে। ফেসবুক মালিক মার্ক জুকেরবার্গ হলেন ফোর্বস পত্রিকার বিচারে বিশ্বের পঞ্চম ধনকুবের। তালিকার চতুর্থ ধনবুকের বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার ওয়ারেন বাফে। মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং অতীতের ধনীতম শিল্পপতি বিল গেটস এখন বিশ্বের তৃতীয় ধনকুবের। ফ্যাশন সংস্থা লুই ভিতোঁ-র কর্ণধার বার্নার্ড অ্যারনল্ট পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। সবাইকে টেক্কা দিয়ে ফোর্বস পত্রিকার তালিকার শীর্ষে এখন অ্যামাজন ডট কম-এর কর্ণধার জেফ বেজোস। উল্লেখ্য, এবছর মার্চে ফোর্বস-এর আর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেখানে মুকেশ অম্বানী ছিলেন ত্রয়োদশ স্থানে। সেখান থেকে আরও চার ধাপ এগোলেন তিনি।

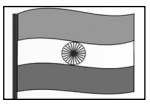

জাতীয়

● **অযোধ্যা মামলার রায় :**

গত ১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে, মুসলিমদের জন্য মসজিদ তৈরি করতে অযোধ্যাতেই অন্যত্র ৫ একর জমি দেবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার। যে জমিতে বাবরি মসজিদ ছিল, সেখানে রামমন্দির তৈরির জন্য কেন্দ্র একটি প্রকল্প তৈরি করবে। সেই প্রকল্পে মন্দির তৈরি ও তার পরিচালনার জন্য তিন মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করতে হবে। বিচারপতিরা সর্বসম্মত হয়ে এই রায় দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রথমেই বলেছিল, এই মামলাকে শুধু জমি বিবাদ হিসেবে দেখা হবে। এদিন ১,০৪৫ পৃষ্ঠার রায়ে বলা হয়েছে, আদালত বিশ্বাস বা আস্থার ভিত্তিতে জমির মালিকানা ঠিক করে না। প্রমাণের ভিত্তিতে ঠিক করে। রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর রিপোর্টেও ভরসা করেছে।

● **নৌবাহিনীতে নতুন ইতিহাস :**

ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন বিহারের মেয়ে শিবাঙ্গি। ২ ডিসেম্বর ককপিটে বসতে চলেছেন দেশের এই প্রথম মহিলা নেভি পাইলট। বিহারের মুজফফরপুরে জন্ম শিবাঙ্গির। পুরো নাম শিবাঙ্গি স্বরূপ। ৪ ডিসেম্বর নৌ দিবস। তার ঠিক দু'দিন আগে ভারতের প্রথম মহিলা নেভি পাইলট হিসাবে কাজ শুরু করবেন তিনি। বর্তমানে কোচিতে তার প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষণ শেষ হলেই তিনি কাজে যোগ দেবেন। ২০১৮ সালের জুন মাসে তাকে কমিশন করেছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল একে চাওলা। নৌবাহিনীতেও এতদিন মহিলারা এভিয়েশন শাখায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার এবং এয়ারক্র্যাফটের অবজারভার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই প্রথম কেউ বিমানের ককপিটে বসতে চলেছেন। এর বাইরেও তার আরও একটা পরিচয় রয়েছে। ভারতের প্রথম নেভি পাইলট তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নও। জাতীয় তাইকোন্ডা চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন তিনি। শিবাঙ্গি ডুব সাঁতারেও দারুণ পারদর্শী।

● **নতুন আধার অ্যাপ :**

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) সম্প্রতি এমআধার অ্যাপের নতুন একটি সংস্করণ লঞ্চ করেছে। যাদের আগের অ্যাপটি ছিল, সেটি ডিলিট করে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস-এর তৈরি নতুন এই অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। এই অ্যাপে থাকবে আধার নম্বর, নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, ঠিকানা ও ছবি। অনেকেই আধার নম্বর অপরিচিতদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান না। সেক্ষেত্রে এই অ্যাপে কিউআর (QR) কোড জেনারেট বা কিউআর কোড স্ক্যান করার সুবিধা আছে। ফলে কাউকে আধার নম্বর না জানিয়েই আপনি কিউআর কোডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। এছাড়াও অ্যাপের সিকিউরিটি ও আধার ব্যবহারের হিস্ট্রির বিষয়েও নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে। দেখে নিন নতুন অ্যাপে কী কী ফিচার রয়েছে—

- ✡ অ্যাপে ঢুকে মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করতে হবে।
- ✡ আধার কার্ড রেজিস্টার করে সেটি ভেরিফিকেশন করাতে হবে।
- ✡ ভেরিফিকেশনের জন্য 'রেজিস্টার ইওর আধার' অপশনে যেতে হবে।
- ✡ রেজিস্টারের জন্য আধার নম্বর দিয়ে ওটিপি-র জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
- ✡ রেজিস্টার করা মোবাইল নম্বরে ওটিপি যাবে।
- ✡ নির্দিষ্ট জায়গায় ওটিপি দিতে হবে।
- ✡ আধার কার্ডের একটি ছবিও আপলোড করতে হবে।

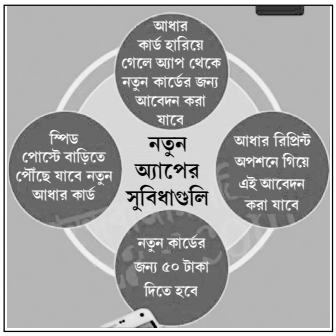

● **রাজ্যসভায় পাস ট্রান্সজেন্ডার বিল :**

লোকসভার পর এবার রাজ্যসভাতেও পাস হল ট্রান্সজেন্ডার বিল। গত ২৬ নভেম্বর এই বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করে কেন্দ্র সরকার। কোনও রকম সংশোধনী ছাড়াই তা পাস হয়ে যায়। এদিন রাজ্যসভায় অধিবেশনের শুরুতেই ট্রান্সজেন্ডার পার্সন (প্রোটেকশন অব রাইটস) বিলটি পেশ করেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী থাবরচন্দ্র গেহলোত। কেবলমাত্র ধ্বনিভোটে তা পাস হয়ে যায়। চলতি বছরের ৫ আগস্ট বাদল অধিবেশনে এই বিলটি লোকসভায় পাস হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের মানুষজনের অধিকার রক্ষা করবে এই বিল; মূলত, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্যই এই বিলটি পেশ করা হয়েছে।

● **মহারাষ্ট্রের নয়া মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে :**

গত ২৬ নভেম্বর, শপথ নেওয়ার মাত্র চার দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন দেবেন্দ্র ফডণবীশ। আর দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ২৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট থেকে আরও ছ'জন এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন—একনাথ শিন্ডে ও সুভাষ রাজারাম দেশাই, কংগ্রেসের নিতীন রাউত ও বালাসাহেব থোরাট এবং এনসিপি-র ছগন ভুজবল ও জয়ন্ত পাটিল।

● **দূরশিক্ষায় ভর্তি নিয়ে ইউজিসি-র বিজ্ঞপ্তি :**

সম্প্রতি এক বিজ্ঞপিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেশের দূরশিক্ষা ও অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির সময়সীমা বেঁধে

দিয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা জানিয়ে দিয়েছে, যদি জানুয়ারিতে সেশন শুরু হয়, ফেব্রুয়ারির পরে আর ভর্তি নেওয়া যাবে না এবং ১৫ মার্চের মধ্যে নিজেদের ওয়েবসাইটে ভর্তির সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে হবে। জুলাইয়ে শুরু হওয়া সেশনের জন্য ভর্তি নেওয়া যাবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ওয়েবসাইটে ভর্তির সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে হবে। ইউজিসি-র বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ভর্তির ক্ষেত্রে পড়ুয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা, পাঠ্যক্রমের সময়সীমা-সহ যাবতীয় বিষয়ে ইউজিসি-র নিয়ম মেনে চলতে হবে। পাঠ শেষে পড়ুয়াদের যে শংসাপত্র দেওয়া হবে, তাতে ভর্তির তারিখ এবং পাঠ্যক্রম শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করতে হবে সুস্পষ্টভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরশিক্ষা ও অনলাইন শিক্ষার যথাযথ অনুমতি আছে কি না, ভর্তির আগে তারা যেন সেটা ভালোভাবে দেখে নেন।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ সম্প্রতি জানা গিয়েছে সহজে ব্যবসা করার (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) মাপকাঠিতে ভারত কতটা উন্নতি করেছে তা যাচাই করতে এখন থেকে কলকাতার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। গত ১৬ নভেম্বর রাজ্যের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র জানালেন, এবার সেই কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের পণ্য পরিবহণ (লজিস্টিক) পরিকাঠামো উন্নয়নেই পুঁজি ঢালবে ওই আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাটি। ঋণের অঙ্ক ২,১০০ কোটি টাকা; পরিকল্পনার রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসবে রাজ্য ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

● **উপনির্বাচনের ফল :**

এবার রাজ্যে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ছিল। যে তিনটি আসনে উপনির্বাচন হল, তার মধ্যে একমাত্র করিমপুরই ছিল তৃণমূলের হাতে। তবে এবার সেখানে জয়ের ব্যবধান ২০১৬-র বিধানসভা এবং ২০১৯-এর লোকসভা ভোটকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। কালিয়াগঞ্জে ব্যবধান খুব বেশি না হলেও এই প্রথম সেখানে জিতল তৃণমূল। আর খড়্গপুরেও তৃণমূলের এই প্রথম জয়।

● **মন্ত্রিসভায় রদবদল :**

রদবদল হল রাজ্য মন্ত্রিসভায়। পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব ছিল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের হাতে। সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নও বেশ কিছু দিন ধরে সামলাচ্ছিলেন তিনি। এই দপ্তরটি এবার তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে শান্তিরাম মাহাতকে দেওয়া হল। বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি দপ্তর এতদিন সামলাচ্ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরটি শোভনদেবের হাত থেকে নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে দেওয়া হল। দপ্তর বদল হল ব্রাত্য বসুরও। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের পাশাপাশি বন দপ্তরও এতদিন সামলাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বনমন্ত্রী হলেন। এতদিন যে দপ্তর তিনি সামলাচ্ছিলেন, সেই অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণের দায়িত্ব পেলেন উত্তরবঙ্গের বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ। শান্তিরামের মতো বিনয়কৃষ্ণও এতদিন দপ্তরবিহীন ছিলেন।

● **শিশু পুষ্টিতে এগিয়ে রাজ্য :**

পুষ্টির মাপকাঠিতে শিশু উন্নয়নে দেশের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। গত পয়লা নভেম্বর 'দ্য স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস চিল্ড্রেন ২০১৯' রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ইউনিসেফ। এবারের রিপোর্টের বিষয় 'শিশুদের খাবার এবং পুষ্টি'। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, ২০০৫-'০৬ সালে 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভের' সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যে কম ওজনের সমস্যায় ভোগা পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর হার ছিল ৩৮.৭ শতাংশ। ২০১৮-য় তা কমে হয়েছে ৩০.৯ শতাংশ। পাঁচ বছরের নিচে বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম, এমন শিশুর হার ২০০৫-'০৬ সালে ছিল ৪৪.৬ শতাংশ। ২০১৮-য় তা কমে হয়েছে ২৫.৩ শতাংশ। শশীদেবী বলেন, অন্য রাজ্যের চেয়ে বাংলা ভালো জায়গায়। দেশে পাঁচ বছরের নিচে কম ওজনের বাচ্চার সংখ্যা হ্রাসের হার ৯.১ শতাংশ। বঙ্গে ৭.৮ শতাংশ।

● **বাংলার রসগোল্লার জিআই তকমা প্রসঙ্গে :**

২০১৭-র ১৪ নভেম্বর জিআই-কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পায় বাংলার রসগোল্লা। গত জুলাইয়ে ওড়িশাও জিআই-তকমা পায় তাদের 'রসগোলা'-র জন্য। দু'টি মিষ্টির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যও উঠে আসে। কিন্তু 'বাংলার রসগোল্লা'-র হয়ে পেশ করা দাবির কয়েকটি দিক নিয়ে আপত্তি তোলেন রমেশচন্দ্র সাহু নামে ভুবনেশ্বরের এক বাসিন্দা। বাংলাই প্রথম 'ছিন্ন হওয়া দুধ' বা ছানাকে দেবতার ভোগে নিবেদন করে, এই যুক্তি দেখিয়ে রসগোল্লার উৎপত্তি বাংলায় বলে দাবি করা হয়। রমেশবাবু এই দাবি সংশোধনের আর্জি জানান। তার দাবি, জগন্নাথধামে রসগোল্লা ভোগের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। তবে জগন্নাথদামের সেই রসগোল্লা আদৌ ছানার গোল্লা কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। চেন্নাইয়ে জিআই নথিভুক্তির দপ্তরে চূড়ান্ত শুনানি হয়। জিআই সংক্রান্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার চিন্নারাজা জি. নায়ডু বলেন, বাংলার রসগোল্লা নিয়ে আপত্তির পক্ষে যুক্তি সাজাতে আবেদনকারীরা অন্তত ৪০ দিন দেরি করেছেন; তাই আপত্তি খারিজ হয়ে গিয়েছে। তবে বাংলার রসগোল্লার জিআই তকমা সংশোধনের আর্জির যৌক্তিকতা তারা বিচার করেননি বলে জানান নায়ডু।

● **বিকল্প আয়ের পথে চা বাগান :**

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিকে মোট জমির ১৫ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ১৫০ একরে অন্য ব্যবসা করার ছাড়পত্র দিল রাজ্য। লক্ষ্য, চা তৈরির পাশাপাশি বিকল্প আয়ের সন্ধান দেওয়া। রাজ্য মন্ত্রিসভা 'টি ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালায়েড বিজনেস পলিসি-২০১৯' প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে টি বোর্ড ও চা শিল্প। তবে থাকছে শর্তও। যেমন, চা চাষের এলাকা কমানো যাবে না। ছাঁটাই করা যাবে না কোনও শ্রমিককে। বিকল্প হিসেবে পর্যটন, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, জলবিদ্যুৎ, অপ্রচলিত শক্তি, সামাজিক পরিকাঠামো ও পরিষেবার মতো ব্যবসা করতে হবে। ওই উদ্বৃত্ত জমির ৪০ শতাংশে পরিবেশের ভারসাম্য রেখে রিসর্ট, ওয়েলনেস সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও নার্সিং কলেজ, হাসপাতাল, সাংস্কৃতিক-বিনোদন কেন্দ্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্যাকেজিং কেন্দ্র তৈরি করা যাবে।

● **স্বচ্ছতার দিশায় :**

স্বচ্ছ ভারত মিশন তথা মিশন নির্মল বাংলার অন্তর্গত উন্মুক্ত শৌচ মুক্তি প্রকল্প। রাজ্যের ১২৫-টি পুরসভার মধ্যে ৫২-টি এখনও উন্মুক্ত শৌচের সমস্যা থেকে মুক্তি পায়নি। সেই সব পুরসভায় এই কর্মসূচি সফল করতে এবার যুগ্মসচিব পর্যায়ের ১০ জন অফিসারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিল পুর দপ্তর। রাজ্যের হিসেব অনুযায়ী উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত হয়ে উঠতে না পারা পুরসভার সংখ্যা ছিল ৪২। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাপকাঠিতে বাংলার ৫২-টি পুরসভায় এখনও এই সমস্যা আছে। তাই ওই ৫২-টি পুরসভাকে উন্মুক্ত শৌচ

মুক্ত (ওডিএফ) করার পরিকল্পনা রূপায়ণে যুগ্মসচিব স্তরের অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হল।

তবে শুধু উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত করলেই রাজ্যের দায়-দায়িত্ব শেষ হবে না। তার সঙ্গে থাকছে 'ওডিএফ প্লাস' এবং 'ওডিএফ প্লাস প্লাস' করার কাজও। 'ওডিএফ প্লাস' হল উন্মুক্ত শৌচ মুক্তির ক্ষেত্রে জলের জোগান, সেই শৌচের কাঠামো এবং বাড়ি নির্মাণ-সহ বিভিন্ন বিষয় ঠিকঠাক আছে কি না, তা দেখা। আর এই প্রকল্পটিকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রক্রিয়া হল 'ওডিএফ প্লাস প্লাস'। বঙ্গের প্রায় ১৫-টি পুরসভা 'ওডিএফ প্লাস'-এর স্তরে রয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যের কোনও পুরসভাই 'ওডিএফ প্লাস প্লাস'-এর স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।

● **১৭,৯৯৬ প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি :**

রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৫৯ হাজার। তার মধ্যে ১৭ হাজার ৯৯৬ স্কুলে আগামী শিক্ষাবর্ষেই পঞ্চম শ্রেণির পঠন-পাঠন চালু হচ্ছে বলে গত ২২ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, যেসব প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ দেওয়ার পরিকাঠামো আছে, সেখানে আসন্ন শিক্ষাবর্ষেই তা চালু হয়ে যাবে। উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিও আগামী শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি নিতে পারবে। তবে ২০২১ সালে প্রাথমিক স্কুলগুলির পঞ্চম শ্রেণি থেকে যারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠবে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে তাদের।

● **আরও আধার সেবা কেন্দ্র চালুর ভাবনা :**

আধার নম্বরের নথিভুক্তি বা সেই সংক্রান্ত তথ্য সংশোধনের জন্য মেট্রো-সহ ৫৩-টি শহরে আধার সেবা কেন্দ্র চালুর কথা গত বছর বলেছিলেন আধার কর্তৃপক্ষ (ইউআইডিএআই)। তার মধ্যে কলকাতায় চারটি কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব ছিল। যার প্রথমটি সম্প্রতি চালু হয়েছে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে। ইউআইডিএআই সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় এই কেন্দ্র চালুর ভাবনা রয়েছে।

আপাতত কথা রয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে বিবাদী বাগে দ্বিতীয় আধার সেবা কেন্দ্রটি চালু করার। এছাড়াও কলকাতায় আরও দু'টি এমন কেন্দ্র চালু হবে। শিলিগুড়ির কেন্দ্রটিও এই অর্থবর্ষে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ইউআইডিএআই-এর। পাশাপাশি, রাজ্যের আরও অন্তত দুই জেলায় এই কেন্দ্র চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর মিলিয়ে প্রায় ১৮০০-টি আধার কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া, বিএসএনএল-এর ২৭-টি গ্রাহক সেবা কেন্দ্রেও আধারের পরিষেবা মেলে।

ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের কেন্দ্রগুলির চেয়ে আধার সেবা কেন্দ্রের পরিকাঠামো বড়ো। প্রতিটিতে কমপক্ষে ১০-টি কাউন্টার। রোজ প্রায় এক হাজার মানুষ পরিষেবা পাবেন। বায়োমেট্রিক তথ্যের মাধ্যমে মিলবে ই-আধার। আধার তৈরি না হলে তার কারণও জানা যাবে। অনলাইনে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার সুবিধা। সাত দিনই সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত খোলা।

অর্থনীতি

● **রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের প্রসঙ্গে :**

চলতি অর্থবর্ষে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। এর জন্য যে এয়ার ইন্ডিয়া, পবন হংস, স্কুটার ইন্ডিয়া, ভারত আর্থ মুভার্স-সহ ২৮-টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা আগেই জানিয়েছিল সরকার। গত ১৮ নভেম্বর লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানালেন, এই সংস্থাগুলির অংশীদারি বিক্রির সিদ্ধান্তে নীতিগত সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল কেমিক্যালস (বিসিপিএল) এবং ব্রিজ অ্যান্ড রুফ রয়েছে। আছে সেলের দুর্গাপুর, সালেম এবং ভদ্রাবতী ইউনিটও। মন্ত্রী জানান, এইচপিসিএল, আরইসি, ড্রেজিং কর্পোরেশন-সহ পাঁচটি সংস্থার কৌশলগত বিলগ্নির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ১৭,৩৬৪ কোটি টাকা রাজকোষে তুলেছে সরকার।

গত ২০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল), কনটেনার কর্পোরেশন (কনকর), শিপিং কর্পোরেশন, নিপকো ও টিহরি জল বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (টিএইচডিসিএল)—এই পাঁচটি সংস্থার শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আর সরকারের হাতে থাকবে না। বাকি দু'টির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে অন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হাতে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানান, বিপিসিএল, শিপিং কর্পোরেশনের যত শেয়ার সরকারের হাতে রয়েছে, তার সবটাই বেসরকারি সংস্থাকে বেচে দেওয়া হবে। তবে বিপিসিএল-এর হাতে থাকা অসমের নুমালিগড় রিফাইনারির বেসরকারিকরণ হবে না। সেটি সরকার বা অন্য কোনও তেল সংস্থা কিনে নেবে।

● **কর আইন সংশোধনী বিল :**

২৬ নভেম্বর, ২০১৯, কেন্দ্রের আনা কর আইন (সংশোধনী) বিল অনুযায়ী, বই মুদ্রক সংস্থা, খনি সংস্থা, সফটওয়্যার তৈরির সংস্থা, গ্যাস বটলিং করাখানা, সিনেমাটোগ্রাফি ফিল্ম উৎপাদক সংস্থা, মার্বেল ব্লককে স্ল্যাবে পরিণত করার উদ্যোগ ১৫ শতাংশ হারে কর্পোরেট করের সুবিধে পাবে না। গত ২৬ নভেম্বর এই বিল সংসদে পেশ করেছে কেন্দ্র। সেপ্টেম্বর কর্পোরেট কর ছাড়ের জন্য কর আইন সংশোধন করতে অধ্যাদেশ এনেছিল কেন্দ্র সরকার। সেই আদেশকে স্থায়ী করতে এই বিল আনা হয়েছে। যেসব সংস্থা কোনও কর ছাড় পায় না তাদের জন্য ইতোমধ্যেই ২২ শতাংশ হারে কর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নয়া বিল অনুযায়ী, কোনও সংস্থা যদি কিছু শর্ত না মানতে পারার ফলে ১৫ শতাংশ হারে কর দেওয়ার সুযোগ না পায় তবে তারা ওই ২২ শতাংশ হারে কর দেওয়ার সুযোগ নিতে পারে। ওই বিল অনুযায়ী, প্রয়োজনে সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে আরও ক্ষেত্রকে কর্পোরেট কর ছাড়ের আওতা থেকে বাদ দিতে পারে।

● **নতুন সদস্য নিয়ে তথ্য দিল এনএসও :**

গত ২৫ নভেম্বর এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন (ইএশআইসি) জানাল, দেশে তাদের প্রকল্পে মোট ১২.২৩ লক্ষ নতুন সদস্য যোগ হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে। আগস্টে তা ছিল ১৩.৩৮ লক্ষ। কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে (ইপিএফ) গত সেপ্টেম্বরে নিট নতুন সদস্য ৯.৯৮ লক্ষ। যা আগস্টে ছিল ৯.৪১ লক্ষ। কেন্দ্রের ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস (এনএসও) এদিন তুলে ধরেছে, ইএসআইসি ও ইপিএফ কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে যোগ দেওয়া নতুন সদস্যের পরিসংখ্যান। জানিয়েছে, ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর, দু'বছরে ইএসআইসি-তে প্রায় ৩.১০ কোটি ঢুকেছেন। এনএসও বলেছে, ইএসআইসি-তে ২০১৮-'১৯ সালে যোগ দিয়েছেন ১.৪৯ কোটি। ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮-র মার্চ পর্যন্ত তা ৮৩.৩৫ লক্ষ। অন্যদিকে, ইপিএফ-এ ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢুকেছেন নিট ২.৮৫ কোটি।

● **বেকারত্বের হিসেব :**

২০১৭-'১৮ সালে জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (এনএসও) করা সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা দেশে গড় বেকারত্বের যা হার (৬৫ শতাংশ), তার তুলনায় সেই হার অনেক বেশি উত্তর-পূর্বের অনেক রাজ্যে। নাগাল্যান্ড (২১.৪ শতাংশ), মণিপুর (১১.৫ শতাংশ), মিজোরাম (১০.১ শতাংশ) এবিষয়ে প্রথম সারিতে। গড় বেকারত্ব বেশি পূর্বের অসম (৭.৯ শতাংশ), বিহার (৭ শতাংশ), ওড়িশা (৭ শতাংশ), ঝাড়খণ্ডেও (৭.৫ শতাংশ)। এই পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার (৪.৬ শতাংশ) জাতীয় গড়ের থেকে কম। গত তিন বছরের বেকারত্বের পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কোন রাজ্য ওই নিরিখে কোথায় দাঁড়িয়ে, সেই সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাবে ২০১৩-'১৪, ২০১৫-'১৬ এবং ২০১৭-'১৮ সালের পরিসংখ্যান রাজ্যসভায় দেন শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। ওই তথ্যে চোখ রাখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অধিকাংশ রাজ্যেই বেকারত্বের হার প্রথম দুই বছরের তুলনায় ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে বেশি। সারা দেশেও ওই হার যথাক্রমে ৩.৪ শতাংশ, ৩.৭ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ। সরকার জানিয়েছে, প্রথম দুই সমীক্ষা যেখানে শ্রম ব্যুরোর করা, সেখানে ২০১৭-'১৮ সালের সংখ্যা মিলেছে জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (এনএসও) সমীক্ষার ভিত্তিতে। যাদের নমুনা বাছাই এবং সমীক্ষার পদ্ধতি আলাদা। অর্থাৎ, তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

● **অর্থ কমিশনের মেয়াদ বাড়ল ১১ মাস :**

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ ১১ মাসে বাড়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগে এক দফায় ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। এবার হল ২০২০ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে তাদের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ২০২০-র ১ এপ্রিল থেকে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, আগামী বাজেটের হিসেব কষতে এন. কে. সিং-এর নেতৃত্বাধীন অর্থ কমিশন ৩০ নভেম্বর অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করবে। কিন্তু তাতে শুধু ২০২০-'১ অর্থবর্ষের সুপারিশ থাকবে। তাদের দ্বিতীয় রিপোর্টের সুপারিশ হবে ২০২১-'২২ থেকে ২০২৫-'২৬ সালের জন্য। অর্থাৎ ছ'বছরের সুপারিশ হবে দু'দফায়। অতীতে তিনবার অর্থ কমিশনকে দু'ভাগে ভেঙে রিপোর্ট দিতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় করের কত টাকা কীভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ হবে, তা ঠিক করে অর্থ কমিশন। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রস্তাব মাফিক ওই করের ৪২ শতাংশ সব রাজ্যের মধ্যে ভাগ হয়। সরকারি বিবৃতিতে দাবি, মেয়াদ বাড়ায় কমিশন সংস্কারের ফলে বিভিন্ন তুলনামূলক আর্থিক পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখতে পারবে।

● **ভারতে শিল্পসংস্থার অবস্থান :**

বাজার মূলধনের (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) অঙ্কে দেশের সবক'টি সংস্থাকেই টপকে গেল 'রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ'। গত ২৮ নভেম্বর রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ পৌঁছল ১০ লক্ষ কোটি টাকায়। যার অর্থ, দেশের সবচেয়ে মূল্যবান ও স্বাস্থ্যবান সংস্থাটির নাম এখন রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ। রিলায়্যান্সের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা 'টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস' (টিসিএস)। তার বাজার মূলধনের পরিমাণ ৭.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা। তবে টিসিএস-এর চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই 'এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক'। তার বাজার মূলধনের পরিমাণ ৭.০২ লক্ষ কোটি টাকা। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) দেওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বাজার মূলধনের পরিমাণে এগিয়ে থাকার তালিকায় চার, পাঁচ, ছয় এবং সাত নম্বরে রয়েছে যথাক্রমে 'হিন্দুস্তান ইউনিলিভার', 'এইচডিএফসি', 'আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক' এবং 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'-র (এসবিআই) নাম। যদিও তালিকায় তিন নম্বরে থাকা এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের চেয়ে বাজার মূলধনের পরিমাণের নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। সংস্থার বাজার মূলধনের পরিমাণ ৪.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা। আবার বাজার মূলধনের পরিমাণের নিরিখে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের (৩.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা) সঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্কের (৩.১১ লক্ষ কোটি টাকা) ফারাকটাও খুব বেশি নয়।

● **গাড়ি না থামিয়েই মেটানো যাবে টোলের টাকা :**

জাতীয় সড়কে টোল দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে কেন্দ্র। যার মাধ্যমে গাড়ি না থামিয়েই টাকা দেওয়া যায়। সারা দেশে পয়লা ডিসেম্বর থেকে এই ফাস্ট্যাগ বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা ছিল। তবে তা পিছিয়ে ১৫ ডিসেম্বর করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক।

ফাস্ট্যাগ গাড়ির ডিজিটাল তথ্যসম্বলিত ট্যাগ বা পাতলা কার্ড। কাজ করে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) প্রযুক্তিতে। লাগাতে হয় গাড়ির সামনের কাঁচে (উইন্ডস্ক্রিন)। এর সাহায্যে গাড়ি না থামিয়েই মেটানো যায় টোলের টাকা। লাইনে দাঁড়াতে হয় না। ট্যাগের সঙ্গে যুক্ত থাকা অ্যাকাউন্ট (ওয়ালেট) থেকেই কেটে নেওয়া হয় এই টাকা। নতুন গাড়ি তৈরির সময়েই এই ট্যাগ লাগানো বাধ্যতামূলক। গাড়ি সংস্থাই সেই দায়িত্ব নেয়। পুরনো গাড়ি হলে ফাস্ট্যাগ কেনার দায়িত্ব মালিকের। একটি ট্যাগ ৫ বছরের জন্য চালু থাকে।

সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশে দেশের সব টোল প্লাজায় এই ব্যবস্থা চালু হবে। এখনও বহু গাড়িতে ওই ট্যাগ নেই, তাই এই নিয়ম বাধ্যতামূলক হলেও টোল প্লাজায় অন্তত কিছু দিন ফাস্ট্যাগের সঙ্গে নগদে টোল দেওয়ার সুবিধাও চালু থাকবে। এ জন্য প্রতি দিকে একটি লেন নির্দিষ্ট থাকবে। টোল প্লাজায় নগদের গেট দিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি মালিক নগদেই নির্ধারিত টোল দেবেন। কিন্তু ট্যাগহীন গাড়ি যদি ফাস্ট্যাগের গেটে ঢুকে পড়ে, তখন দ্বিগুণ টোল দিতে হবে। ফাস্ট্যাগ ব্যাঙ্ক, ই-কমার্স সংস্থা ও ওয়ালেট মারফত কেনা যাবে। প্রতিটি টোল প্লাজাতেও ওই ট্যাগ কেনার সুবিধা রাখছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)। লাগবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া ফাস্ট্যাগের আবেদনপত্র (ভর্তি করতে হবে), গাড়ি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (যেখানে গাড়ির সমস্ত তথ্য লেখা থাকে), গাড়ির মালিকের পাসপোর্ট সাইজ ছবি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ধরনের (যাত্রীবাহী, বাণিজ্যিক) সঙ্গে মিলিয়ে জমা দিতে হবে কেওয়াইসি নথিও। গাড়ি বিক্রি করে দিলে ব্যাঙ্কে গিয়ে সেটির ফাস্ট্যাগের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেট বন্ধের আর্জি জানাতে হবে। একই ব্যবস্থা নিতে হবে গাড়ি চুরি গেলেও।

ফাস্ট্যাগের নির্দিষ্ট দাম থাকে। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে ফাস্ট্যাগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। তার বাইরেও ব্যাঙ্ক টাকা নেয়। যা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বিশেষে আলাদা হতে পারে। ব্যাঙ্কই ব্যবস্থা করে দেবে আলাদা ওয়ালেটের। সেখানেই টাকা ভরাতে হবে। টোল দেওয়ার সময় ওই ব্যালান্স থেকেই তা কেটে নেওয়া হবে। টাকা ভরানো যাবে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেফ্‌ট, আরটিজিএস, নেট ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির মাধ্যমে। যদি একই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা হয় তাহলে নেওয়া যায় মাসিক পাসও। মাইফাস্ট্যাগ অ্যাপেরও সুবিধা নেওয়া যায়। ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে টোল দিলে আপাতত ২.৫ শতাংশ ক্যাশব্যাকের সুবিধা মিলবে।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৫-টি প্লাজা রয়েছে। এখনও বাধ্যতামূলক না হলেও ইতোমধ্যেই সেগুলিতে ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে টোল দেওয়ার সুবিধা চালু হয়েছে। হিসেব বলছে, দু'মাস আগে রাজ্যের টোল প্লাজা দিয়ে যাওয়া প্রতি ৫-টি গাড়ির মধ্যে একটিতে ওই ট্যাগ থাকত। এখন প্রতি

৪-টি গাড়ির মধ্যে ১-টিতে থাকছে। রাজ্যে কিছু দিন আগে টোল প্লাজাগুলিতে ৩০-৪০-টি ফাস্ট্যাগ বিক্রি হলেও এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১,০০০-টি।

খেলা

- পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সুমন দাস। মহারাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বডি বিল্ডিংয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক স্তরে দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছেন সুমন। গত ১৬-১৭ নভেম্বর এই ডায়মন্ড কাপ প্রতিযোগিতাটি হয়। সেখানে জয়ের ফলে সুমন এবারে 'এলিট প্রো কার্ড' পেয়ে গেলেন। ফলে যোগ দিতে পারবেন আন্তর্জাতিক 'প্রো' চ্যাম্পিয়নশিপে, মিস্টার অলিম্পিয়াডে যোগ দিতে যাওয়ার যেটা পূর্ব শর্ত। তার পরে সেই 'প্রো' প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে হবে।
- রাজ্যের হয়ে জাতীয় পদক পেল জলপাইগুড়ির ছেলে। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে ৩৫তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা চলছে। সেখানে ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে জ্যাভলিন ছোঁড়ায় ব্রোঞ্জ পদক জিতল বোলবাড়ি নীলকান্ত পাল হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র জয়দেব রায়।

● **টোকিও অলিম্পিকে ভারতের মহিলা হকি দল :**

গত ২ নভেম্বর টোকিও অলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দ্বিতীয় লেগে ভারতের মহিলারা ১-৪ হার মানলেও এগ্রিগেটে ভারত ৬-৫ জিতে টোকিওর ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলে। প্রথম লেগে ভারত ৫-১ গোলে হারিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। সেই জয়ের ফলে অলিম্পিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়েছিল ভারত। এদিন আমেরিকার প্রাধান্য থাকলেও রানি রামপালের করা একমাত্র গোল ভারতকে পৌঁছে দেয় টোকিয়ে অলিম্পিকে। এই নিয়ে তিনবার (১৯৮০, ২০১৬ এবং ২০২০) অলিম্পিকে যাচ্ছে ভারতের মহিলা হকি দল। দ্বিতীয় লেগে দাপট দেখালেও টোকিও অলিম্পিকের দরজা যে বন্ধ হয়ে যাবে তাদের জন্য, তা ভাবতেই পারেননি আমেরিকার মহিলা হকি দলের খেলোয়াড়রা।

● **যুব বিশ্বকাপে সেরা ব্রাজিল :**

নাটকীয় বিশ্বজয়। ২০১৯ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ব্রাজিলই শেষ পর্যন্ত খেতাব জিতল! দু'বছর আগে ভারতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ব্রাজিলের। এ বছর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি পেলে, জিকো, রোনাল্ডো, নেমারের উত্তরসূরিরা। এবছর অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব ছিল পেরুর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা সরে দাঁড়ানোয় এগিয়ে আসে ব্রাজিল। আয়োজক দেশ হিসেবে মূল পর্বে খেলার দরজা খুলে যায় তাদের সামনে। গত ১৭ নভেম্বর ব্রাসিলিয়ায় রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মেক্সিকোকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল। প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকেই চতুর্থবারের জন্য খেতাব ঘরে তুলল তারা।

● **ইউরো ২০২০ :**

ইউরো ২০২০-র মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া ও অস্ট্রিয়া। পরের বছরের ১২ জুন ইটালিতে মূল টুর্নামেন্ট শুরু। খেলবে ২৪ দেশ। ইতোমধ্যে যোগ্যতা অর্জন করেছে ১৬ দেশ। যার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, ইংল্যান্ডের মতো বড়ো নাম। নেদারল্যান্ডস শেষ বড়ো টুর্নামেন্টের মূলপর্বে খেলে ২০১৪-র বিশ্বকাপে। এবারের ইউরোর মূল লড়াইয়ে অংশ নিতে দরকার ছিল এক পয়েন্ট। গত ১৬ নভেম্বর তারা বেলফাস্টে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ০-০ ড্র করে। পাশাপাশি জার্মানি টানা ১৩ বার মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। নিজেদের মাঠে তারা ৪-০ হারিয়েছে বেলারুশকে।

উল্লেখ্য, লাক্সেমবার্গকে ২-০ হারিয়ে পর্তুগাল মূলপর্বে উঠলেও দেশের হয়ে শততম গোলের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। এদিন তিনি ৯৯তম গোলটি অবশ্য করেছেন। পর্তুগালের অন্য গোলটি করেন ব্রুনো ফার্ন্যান্দেস। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও এই ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের কাছে। গ্রুপে দ্বিতীয় দল হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে তাদের জিততেই হ'ত। ক্রোয়েশিয়া মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করল স্লোভাকিয়াকে ৩-১ হারিয়ে। ম্যাচ ড্র করলেই লুকা মদ্রিচরা যোগ্যতা অর্জন করত। অস্ট্রিয়া যোগ্যতা অর্জন করল উত্তর ম্যাসেডোনিয়াকে ২-১-এ হারিয়ে। আর নিয়মরক্ষার খেলায় ইংল্যান্ড ৪-০ হারাল কসোভোকে।

● **স্পেনের দাভিদ ভিয়ার অবসর ঘোষণা :**

বিশ্ব ফুটবলে স্পেনের অবিশ্বাস্য সাফল্যের নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। দেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলদাতাও (৯৮ ম্যাচে ৫৯ গোল) তিনি। সেই দাভিদ ভিয়া এবার ফুটবলকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মরসুম শেষ হলেই পেশাদার ফুটবল থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। ৩৭ বছর বয়সি ভিয়া এই মরসুমে জাপানের 'জে' লিগের ক্লাব ভিসেল কোবেতে আর এক স্প্যানিশ কিংবদন্তি আন্দ্রে ইনিয়েস্তার সঙ্গে খেলছেন। ভিয়ার উত্থান স্পোর্টিং খিখন থেকে। ২০০২ সালের অনূর্ধ্ব-২১ স্পেনের জাতীয় দলে সুযোগ পান তিনি। তিন বছর পরে সিনিয়র দলে। ২০০৮ সালে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভিয়া। চারটি গোল করে সোনার বুট পান। ২০১০ সালে স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। সেই মরসুমেই বার্সেলোনার জার্সিতে ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-১-এ হারিয়ে জেতেন চ্যাম্পিয়ন লিগ। ভিয়া একটি গোল করেন। বাকি দু'গোল করেছিলেন মেসি ও পেদ্রো। ২০১৩-'১৪ মরসুমে বার্সেলোনা ছেড়ে আতলেতিকো দে মাদ্রিদে যান তিনি। পরের মরসুমেই সই করেন মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ক্লাব নিউ ইয়র্ক সিটি-তে। এই মরসুমে যোগ দেন জাপানের ভিসেল কোবে-তে। ভিয়ার ১৯ বছরের বর্ণময় ফুটবল জীবন এবার সমাপ্তির পথে।

● **ঐতিহাসিক সিরিজ জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজে :**

স্মৃতি মান্ধানা এবং জেমাইমা রদ্রিগেজের ব্যাটিং দাপটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হরিয়ে এক দিনের সিরিজ জিতল ভারতীয় মহিলা দল। অ্যান্টিগায় তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ছয় উইকেটে জিতে ২-১ ফলে সিরিজ ছিনিয়ে নিল মিতালি রাজের দল। তৃতীয় তথা সিরিজের শেষ ম্যাচে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ১৯৫ রান তাড়া করার লক্ষ্য ছিল ভারতের সামনে। স্মৃতি (৭৪) এবং জেমাইমা (৬৯) শুরুতেই শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেন দলকে। দু'জনে ওপেনিং জুটিতে তোলেন ১৪১ রান। দুই ওপেনারের দাপটেই ৪৭ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যায় ভারত। কিন্তু ওপেনারদের পাশাপাশি বলতে হবে ঝুলন গোস্বামীর কথাও। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শেষের দিকে বল হাতে ভাঙেন ঝুলন। প্রথমে ব্যাট করে ১৮০-৫ থেকে ১৯৪ রানে অলআউট

হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঝুলন ওই সময় তুলে নেন দু'টি উইকেট। ৫৯তম ওভারে একটি রান আউটও করেন। মূল্যবান রান আউট করার পাশাপাশি ৩০ রানে দুই উইকেট নেন তিনি। লেগস্পিনার পুনম যাদবও নেন দুই উইকেট।

● **শচীন তেণ্ডুলকরের রেকর্ড ভাঙলেন শেফালি বর্মা :**

ভাঙল শচীন তেণ্ডুলকরের গড়া রেকর্ড। সবচেয়ে কমবয়সি ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অর্ধশতরান করার কৃতিত্ব এত দিন ছিল মাস্টারব্লাস্টারের দখলে। গত ৯ নভেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে ৮৪ রানে জেতানোর পাশাপাশি শচীনের সেই রেকর্ডও ভেঙে দিলেন হরিয়ানার ১৫ বছরের মহিলা ক্রিকেটার শেফালি বর্মা। শচীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার প্রথম অর্ধশতরান করেছিলেন ১৬ বছর ২১৪ দিন বয়সে। তিন দশক ধরে অটুট থাকা শচীনের সেই রেকর্ড শেফালি ভাঙলেন ১৫ বছর ২৮৫ দিনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে শেফালি করেন ৪৯ বলে ৭৩ রান।

ড্যারেন স্যামি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে জীবনের পঞ্চম আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে খেলতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন হরিয়ানার মেয়ে শেফালি। ছ'টি চার ও চারটি ছক্কা ছিল তার ইনিংসে। শুধু শচীনের রেকর্ড ভাঙাই নয়, স্মৃতি মান্ধানার (৬৭) সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ১৪৩ রানের জুটি তৈরি করেও নতুন রেকর্ড গড়েছেন দু'জনে। শুরুতে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে চার উইকেটে ১৮৫ রান করেছিল ভারতীয় মেয়েরা। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস শেষ হয় ১০১-৯। ভারতের হয়ে রাধা যাদব পান ১০ রানে দুই উইকেট। শিখা পাণ্ডেও ২২ রান দিয়ে পান ২ উইকেট।

● **হ্যাটট্রিকে রোনাল্ডোর কীর্তি স্পর্শ মেসির :**

ক্যাম্প ন্যুতে খেলতে নামার আগেই লিও মেসিরা জেনে গিয়েছিলেন, রিয়াল মাদ্রিদ ৪-০ জিতে চলে গিয়েছে লা লিগার শীর্ষে। এরপর সেল্টা ভিগোকে ৪-১-এ উড়িয়ে গোলপার্থক্যে লা লিগার শীর্ষে চলে গেল বার্সেলোনা। বার্সার এই দুর্দান্ত জয়ের সৌজন্যে অবশ্যই রয়েছে সেই মেসি ম্যাজিক। চলতি মরসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন এল. এম. টেনা। যার মধ্যে রামধনুর মতো বাঁকানো ফ্রি-কিক থেকে দু'টি গোল। তার আগে অবশ্য প্রথম গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে। বার্সার অন্য গোলদাতা সের্খিয়ো বুস্কেৎস। লা লিগায় এটি মেসির ৩৪তম হ্যাটট্রিক। যা ছুঁয়ে ফেলল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর করা হ্যাটট্রিকের সংখ্যা। লিগে ছয় ম্যাচে আটটি গোল করে ফেললেন মেসি। যার অর্ধেক করেছেন ফ্রি-কিক থেকে।

● **প্রথমবার আইপিএল গুয়াহাটিতে :**

রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরে গতবারের আইপিএল-এ নজর কেড়েছিলেন রিয়ান পরাগ। অসমের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল-এ খেলেন রিয়ান। এবার তার রাজ্যেই আইপিএল-এর ম্যাচ হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আইপিএল হলেও অসমে এই টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচও হয়নি। এই রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা যাতে ঘরের ছেলের খেলা দেখতে পারেন, সেই কারণেই রাজস্থান রয়্যালস গুয়াহাটিতে তাদের হোম ম্যাচ খেলার আবেদন জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। রাজস্থান রয়্যালসের সেই আবেদন মেনেও নেওয়া হয়। তিনটি ম্যাচ খেলার জন্য আগেই বোর্ডের কাছে আবেদন করেছিল রয়্যালস। আইপিএল-এর গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়ে দেয়, তিনটির পরিবর্তে দু'টি ম্যাচ হবে গুয়াহাটিতে। আইপিএল-এর আগেই অবশ্য গুয়াহাটিতে বসছে আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ। ৫ জানুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-২০ ম্যাচ খেলা হবে গুয়াহাটির স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচের পরে রাজস্থান রয়্যালসের ঘরের মাঠ হিসেবে সাজিয়ে তোলা হবে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম।

● **প্যারা জুড়ো কমনওয়েলথ গেমসে বুদ্ধদেবের ব্রোঞ্জ :**

ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্যারা জুডো কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বুদ্ধদেব। এটাই চিল বুদ্ধদেবের প্রথম বিদেশ সফর। প্যারা জুডো প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল বার্মিংহামের ওয়ালসালে। ভারত থেকে ২০ জনের দল যোগ দিয়েছিল। বুদ্ধদেব ৬০ কিলোগ্রামের কম ওজনের বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। তার প্রথম লড়াই ছিল আলেবেনিয়ার খেলোয়াড়ের সঙ্গে। আড়াই মিনিটের মধ্যেই বুদ্ধদেব জয় পান। প্রতিপক্ষদের মধ্যে স্কটল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিলেন দেশীয়। এর আগে বুদ্ধদেব দেশের মাটিতে মুখোমুখি হয়েছিলেন সেই প্রতিপক্ষের। গোরক্ষপুরে জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে রোহিত নামের ওই প্রতিপক্ষকে হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে ঘটে গেল বিপর্যয়। সেই প্রতিপক্ষও ছিলেন দেশের। মধ্যপ্রদেশের কপিল পারমার। তিন মিনিটে ম্যাচ হেরে যান বুদ্ধদেব। পরে ব্রোঞ্জ ফাইনালের জন্য আর একটি ম্যাচ খেলতে হয়। সেই ম্যাচে বিপরীতে ছিলেন শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়। লড়াই বেশ হাড্ডাহাড্ডি হয়। পাঁচ মিনিটের খেলায় দু'জনের পয়েন্ট সমান হয়। ফলে ম্যাচ চলে যায় গোল্ডেন স্কোরে। এই পর্যায়ে প্রথম যে স্কোর করতে পারেন, জেতেন তিনিই। বুদ্ধদেব শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন।

● **সারলোরলাক্স ওপেন চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য সেন :**

দুরন্ত ছন্দে লক্ষ্য সেন। গত ৩ নভেম্বর জার্মানিতে তিনি চিনের ওয়েং হং ইয়াং-কে হারিয়ে সারলোরলাক্স ওপেন চ্যাম্পিয়ন হন। এই নিয়ে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার টানা দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ট্যুর ১০০ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা জিতলেন ১৮ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা। অষ্টম বাছাই লক্ষ্য সেনকে ফাইনাল জিততে লড়াই করতে হয় প্রায় এক ঘণ্টা। মরসুমে তার টানা তৃতীয় সিঙ্গলস খেতাব এটি। এর আগে বেলজিয়ান আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ এবং ডাচ ওপেন সুপার ট্যুর ১০০ প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন লক্ষ্য। বিশ্বের ৫১ নম্বর লক্ষ্য এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, যুব অলিম্পিক্সে রুপো এবং বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয়ের পরে সিনিয়র সার্কিটেও অসাধারণ ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন এই জয়ের পরে বিশ্ব ক্রম পর্যায়ে ৫০-এর মধ্যে চলে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ফাইনালে নামার আগে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিয়ে ৫১ নম্বরে থাকা লক্ষ্যের।

● **পঞ্চমবার প্যারিস মার্স্টাসে চ্যাম্পিয়ন নোভাক :**

নজির গড়ে পঞ্চমবার প্যারিস মার্স্টাসে চ্যাম্পিয়ন হলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে ডেনিস শাপোভালভকে হারিয়ে। এই জয়ে সার্বিয়ান তারকার এক নম্বর হিসেবে বছর শেষ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। কুড়ি বছরের শাপোভালভ অবশ্য রাফায়েল নাদাল সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলতে না পারায় ফাইনালে নোভাকের মুখোমুখি হন। এই টুর্নামেন্টে গতবার ফাইনালে রাশিয়ার কারেন খাচানভের কাছে হেরেছিলেন জোকোভিচ। এবারের ফাইনালে কিন্তু শাপোভালভ দাঁড়াতেই পারেননি। ম্যাচে একবার মাত্র তাকে ব্রেক পয়েন্ট বাঁচাতে হয়েছে। কানাডার তরুণের বিরুদ্ধে চারবার খেলে একবারও হারেননি সার্বিয়ান তারকা। তিনি মোট ৩৪-টি মাস্টার্স খেতাব জিতলেন টেনিস জীবনে। আর একটা জিতলে ধরে ফেলবেন নাদালকে। আর এটিপি ট্যুরে জোকোভিচের এটা ৭৭ নম্বর খেতাব। এই বছর তিনি উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ছাড়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মাদ্রিদ, টোকিয়ো ওপেনেও।

● **মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২০ :**

আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ। গত পয়লা নভেম্বর মেলবোর্নে সেই প্রতিযোগিতার ট্রফি উন্মোচন করলেন ভারতীয় অভিনেত্রী করিনা কপূর খান। স্কটল্যান্ডে বাছাই পর্বে প্রতিযোগিতা জেতায় বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে গ্রুপ 'এ'-তে। এই গ্রুপের বাকি দল : অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। বাছাই পর্ব টপকে মূলপর্বে ১২ বছর পরে খেলবে তাইল্যান্ড। 'বি' গ্রুপে তাদের সঙ্গে রয়েছে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ হবে মেলবোর্নে।

● **শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ অস্ট্রেলিয়ার :**

অ্যাডিলেডে প্রথম টি-২০-তে জয় এসেছিল ১৩৪ রানে। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টি-২০-তে জয় এসেছিল নয় উইকেটে। আর গত পয়লা নভেম্বর মেলবোর্নে তৃতীয় টি-২০-তে অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে হারাল শ্রীলঙ্কাকে। একই সঙ্গে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করল সফরকারী দলকে। এই জয়ে বড়ো অবদান থাকল বাঁ-হাতি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের। এই সিরিজে দুরন্ত ছন্দে আছেন তিনি। প্রথম টি-২০-তে করেছিলেন সেঞ্চুরি (অপরাজিত ১০০)। দ্বিতীয় টি-২০-তে অপরাজিত ছিলেন হাফ-সেঞ্চুরি করে (অপরাজিত ৬০)। আর এদিনও করলেন হাফ-সেঞ্চুরি (অপরাজিত ৫৭)। এই সিরিজে একবারও আউট হননি তিনি। মেলবোর্নে তার ৫০ বলের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও একটি ছয়। ওয়ার্নারের ইনিংসের সুবাদেই ১৪ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল অস্ট্রেলিয়া (১৭.৪ ওভারে ১৪৫-৩)।

● **মুম্বই সিটির নতুন মালিক ম্যাঞ্চেস্টার সিটি :**

গত ২৮ নভেম্বর ভারতীয় ফুটবলে বিপ্লব ঘটে গেল। আইএসএল-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই সিটি এফসি-র ৬৫ শতাংশ মালিকানা কিনে নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বাকি ৩৫ শতাংশ মালিকানা বলিউড তারকা রণবীর কপূর ও বিমল পারেখের। এদিন মহালক্ষ্মীর ঐতিহ্যশালী ফেমাস স্টুডিয়োয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন নীতা অম্বানী। ১৯৪৬ সালে তৈরি ফেমাস স্টুডিয়োতেই এশিয়ার প্রথম শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই স্টুডিয়োর অবদান প্রচুর। এবার সেখানেই ভারতীয় ফুটবলের নতুন ইতিহাস লেখা হল এদিন। ম্যান সিটি কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিটি এফসি, জাপানের ইয়োকোহামা, স্পেনের খিরোনা এফসি, উরুগুয়ের ক্লাব আতলেতিকো, চিনের সিচুয়ান জিউনিউ এফসি-র অংশীদার হয়েছে। এবার যুক্ত হলেন ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে।

● **তিরন্দাজি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য :**

বাংলার এবং ভারতের অন্যতম সেরা তিরন্দাজ অতনু দাস আগেই পুরুষদের দলগত রিকার্ভ বিভাগে টোকিয়োতে নামার টিকিট জোগাড় করে ফেলেছিলেন। বরানগরের ছেলে এবং টাটা অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী অতনু টোকিয়োতে ছেলেদের বিভাগে নামবেন তরুণদীপ পাই এবং প্রবীণ যাদবের সঙ্গে। গত ২৮ নভেম্বর তার স্ত্রী দীপিকা কুমারীও পেয়ে গেলেন স্বামীর সঙ্গে জাপানগামী বিমানে ওঠার টিকিট। এদিন ব্যাঙ্ককে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দীপিকা সোনা জিতলেন মেয়েদের রিকার্ভ বিভাগে এবং অর্জন করলেন অলিম্পিক্সে নামার যোগ্যতা। ফাইনালে অসাধারণ লক্ষ্যভেদ করলেন বৌমা। ৭-২ ম্যাচে হারালেন মালয়েশিয়ার নুর আফিসা আব্দুল হালিলকে। দীপিকা ছাড়াও রুপো জিতলেন অঙ্কিতা ভকত। সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা থেকে ভারতের তিরন্দাজরা একটি সোনা, দু'টি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ জিতল।

● **প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগের নিলাম :**

প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগের নিলামে সর্বোচ্চ দর পেলেন পি. ভি. সিন্ধু এবং বিশ্বের এক নম্বর মহিলা সিঙ্গলস খেলোয়াড় তাই জু ইং। দু'জনেরই দর উঠল ৭৭ লক্ষ টাকা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধুকে তার ফ্র্যাঞ্চাইজি হায়দরাবাদ হান্টার্স ধরে রাখল এই মূল্যে। তবে তাই জু-কে সই করাতে পুণে সেভেন এসেস ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে লড়াই করতে হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু র‍্যাপ্টর্সকে। একই সঙ্গে চেন্নাই সুরাপস্টারজ ৬২ লক্ষ টাকায় দলে নিল ১৯ বছর বয়সি ভারতীয় ডাবলস তারকা সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-কে। শুধু তাই জু-কে সই করানোই নয়, পুরুষদের সিঙ্গলসে আর এক ভারতীয় তারকা বি. সাই প্রণীতকেও বেঙ্গালুরু ধরে রাখল ৩২ লক্ষ টাকায়। এছাড়া ফ্র্যাঞ্চইজিরা অন্য যেসব ভারতীয় খেলোয়াড়দের ধরে রেখেছে এই নিলামে, তাদের মধ্যে বি. সুমিত রেড্ডি (১১ লক্ষ টাকায় চেন্নাই সুপারস্টারজ) এবং চিরাগ শেট্টি (১৫.৫০ লক্ষ টাকায় পুণে সেভেন এসেস)। বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বের ন'নম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেইওয়ান ঝ্যাং-কে ধরে রাখল আওয়াধি ওয়ারিয়র্স ৩৯ লক্ষ টাকায়।

উঠতি তারকাদের মধ্যে এবার নজর ছিল জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচন্দের মেয়ে গায়ত্রীর উপরে। তাকে চেন্নাই সুপারস্টারজ সই করায়। পাশাপাশি অসমের উঠতি খেলোয়াড় অস্মিতা চালিহাকে তারই ঘরের মাঠের দল নর্থ ইস্টার্ন ওয়ারিয়র্স কিনল ৩ লক্ষ টাকায়। তবে এবার পঞ্চম মরসুমের পিবিএল-এ খেলতে দেখা যাবে না দুই ভারতীয় তারকা সাইনা নেহওয়াল এবং কিদম্বি শ্রীকান্তকে। তারা ২০২০ অলিম্পিকের আগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আরও জোর দিতেই সরে দাঁড়িয়েছেন এবারের পিবিএল থেকে। মোট ১৫৪ জন খেলোয়াড়ের নাম ছিল এই নিলামে। ২০ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পঞ্চম মরসুমের পিবিএল। যাতে সব মিলিয়ে ৭৪ জন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে লড়াই করতে দেখা যাবে। মোট ফ্র্যাঞ্চাইজি সাতটি। আওয়াধি ওয়ারিয়র্স (লখনউ), বেঙ্গালুরু র‍্যাপ্টর্স (বেঙ্গালুরু), মুম্বই রকেটস (মুম্বই), হায়দরাবাদ হান্টার্স (হায়দরাবাদ), চেন্নাই সুপারস্টারজ (চেন্নাই), নর্থ ইস্টার্ন ওয়ারিয়র্স (নর্থ ইস্ট) এবং পুণে সেভেন এসেস (পুণে)। খেলা হবে চারটি শহর—বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ এবং লখনউয়ে।

● **ডেভিস কাপ সেরা স্পেন :**

চলতি মরসুম তিনি আগেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থেকে শেষ করা নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন। এবার সেই কৃতিত্বে আরও একটি পালক জুড়লেন রাফায়েল নাদাল। স্পেনকে আবার ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়ন করে। নাদালের দাপটে ফাইনালে কানাডাকে হারাল স্পেন। নাদাল ৬-৩, ৭-৬ (৯-৭) ফলে ডেনিস শাপোভালভকে হারাতেই ২-০ এগিয়ে গিয়ে স্পেনের খেলোয়াড়েরা ষষ্ঠবার ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। তার আগে রবের্তো বাতিস্তা আউত ৭-৬ (৭-৩), ৬-৩ ফলে ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমেকে হারিয়ে স্পেনকে খেতাবের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। স্পেন দলের পাঁচ সদস্যই এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কিন্তু ঘরের মাঠের দর্শকের সামনে নাদালের দুরন্ত পারফরম্যান্স বড়ো পার্থক্য গড়ে দেয়।

এর আগে ২০০০, ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১১ সালে স্পেন ডেভিস কাপ সেরা হয়। যার মধ্যে ফাইনালে ১৯ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী নাদাল খেলেন ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ সালেও। ২০০৮ সালের

ফাইনালে নাদাল খেলতে পারেননি চোটের জন্য। ৩৩ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকা এবার আটটি রাবারের মধ্যে আটটিই জেতেন। সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়ের পুরস্কারও পান তিনি। যার মধ্যে দু'টি ম্যাচ সিঙ্গলস ও ডাবলসে জেতেন ব্রিটিনের বিরুদ্ধে। তার পরে জয় পান শাপোভালভের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে।

● **নজির গড়লেন কর্ণাটকের মিঠুন :**

এক ওভারে হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট। গত ২৯ নভেম্বর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ইনিংসের শেষ ওভারে এমনই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটালেন কর্ণাটকের পেসার অভিমন্যু মিঠুন। হরিয়ানার ইনিংসের ২০তম ওভারের প্রথম বলে হিমাংশু রানাকে ফেরান মিঠুন। রানার ক্যাচ ধরনের ময়াঙ্ক আগরওয়াল। ওভারের দ্বিতীয় বলে রাহুল টেয়াটিয়ার ক্যাচ ধরেন করুণ নায়ার। মিঠুনের হ্যাটট্রিক আসে সুমিত কুমারকে ফিরিয়ে। এবার ক্যাচ ধরেন কদম। ওভারের চতুর্থ বলে অমিত মিশ্রকে নেন মিঠুন। ক্যাচ ধরেন কৃষ্ণাপ্পা গৌতম। পরের বল ওয়াইড। তার পরের বলে আসে এক রান। ওভারের শেষ বলে জয়ন্ত যাদবকে ফেরান মিঠুন। ক্যাচ ধরেন লোকেশ রাহুল। অর্থাৎ, দুই রান দিয়ে সেই ওভারে পাঁচ উইকেট নেন মিঠুন। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে ১৯৪ তোলে হরিয়ানা। জবাবে পাঁচ ওভার বাকি থাকতে দুই উইকেট খুইয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় কর্ণাটক (১৯৫-২)। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিল কপসন (ডার্বিশায়ার বনাম ওয়ারউইকশায়ার, ১৯৩৭), উইলিয়াম হেন্ডারসন (নর্দার্ন ট্র্যান্সভাল বনাম অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ১৯৩৮), প্যাট পোকক (সারে বনাম সাসেক্স, ১৯৭২), ইয়াসের আরাফত (রাওয়ালপিণ্ডি বনাম ফয়সালাবাদ ২০০৪), নিল ওয়াগনার (ওটাগো বনাম ওয়েলিংটন, ২০১১) এক ওভারে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন।

৩০ বছর বয়সি দেশের হয়ে চার টেস্ট ও পাঁচ ওয়ান ডে খেলেছেন। ২০১০ সালে অভিষেক হয়েছিল তার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাকে শেষ দেখা গিয়েছে ২০১১ সালে। আইপিএল-এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেছেন তিনি। এর আগে রঞ্জি ট্রফি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতেও হ্যাটট্রিক করেছিলেন মিঠুন। এবার করলেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে। এই বছরই বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে কর্ণাটকের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সেরা তিন প্রতিযোগিতায় এর আগে কোনও বোলারের হ্যাটট্রিক ছিল না। মিঠুনই প্রথম এই নজির গড়লেন। টি-২০ ফরম্যাটে ওভারে পাঁচ উইকেট নেওয়ার ঘটনা এর আগে একবারই ঘটেছে। ২০১৩ সালে ঘরোয়া টি-২০ ম্যাচে বাংলাদেশের পেসার আল আমিন হোসেন এক ওভারে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন। মিঠুন হলেন দ্বিতীয় পেসার যিনি ২০ ওভারের ফরম্যাটে ওভারে পাঁচ উইকেট নিলেন।

● **বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারত সফর :**

টি-২০ সিরিজ :

টি-২০-তে প্রথমবার ভারতকে হারাল বাংলাদেশ : গত ৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ছয় উইকেট হারিয়ে ভারত তুলেছিল ১৪৮ রান। ১৪৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে তিন বল বাকি থাকতে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ। জয় এল সাত উইকেটে। একইসঙ্গে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল মাহমুদুল্লাহর দল। সিরিজের শেষ দুই টি-২০-তে অবশ্য জিতেই যায় রোহিত শর্মার দল। কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে ভারতকে এই প্রথমবার হারাল বাংলাদেশ। শাকিব আল হাসান-তামিম ইকবালদের অনুপস্থিতিতে সেই জয়ের নায়ক হলেন মুশফিকুর রহিম। মাহমুদুল্লাহ ছয় মেরে ম্যাচ শেষ করলেও মুশফিকুরের

	ভারত	বাংলাদেশ
তারিখ	৩-২৬ নভেম্বর ২০১৯	
অধিনায়ক	বিরাট কোহলি (টেস্ট) রোহিত শর্মা (টি-২০)	মমিনুল হক (টেস্ট) মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (টি-২০)
টি-২০ আন্তর্জাতিক সিরিজ		
ফলাফল	৩-ম্যাচের সিরিজ ভারত ২-১-এ জয়ী হয়	
সর্বাধিক রান	শ্রেয়াস আইয়ার (১০৮)	মোহাম্মদ নাইম (১৪৩)
সর্বাধিক উইকেট	দীপক চাহার (৮)	আমিনুল ইসলাম (৪) শফিউল ইসলাম (৪)
সিরিজ সেরা	দীপক চাহার (ভারত)	
টেস্ট সিরিজ		
ফলাফল	২-ম্যাচের সিরিজ ভারত ২-০-তে জয়ী হয়	
সর্বাধিক রান	মায়াঙ্ক আগরওয়াল (২৫৭)	মুশফিকুর রহিম (১৮১)
সর্বাধিক উইকেট	ইশান্ত শর্মা (১২) উমেশ যাদব (১২)	আবু জায়েদ (৬)
সিরিজ সেরা	ইশান্ত শর্মা (ভারত)	

অপরাজিত ৬০ রানই তফাত গড়ে দিল। যা এল ৪৩ বলে, আটটি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে।

অস্ট্রেলিয়াকে টপকে টি-২০-তে অভিনব রেকর্ড ভারতের : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হারে রোহিত শর্মার দল। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান শর্মা। তার পরে রান তাড়া করতে নেমে অনায়াসে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। রাজকোটে জেতার ফলে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনে ভারতীয় দল। সেই সঙ্গে গড়েছে একটি রেকর্ডও। আন্তর্জাতিক টি-২০-তে রান তাড়া করে সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড গড়েছে ভারত। রান তাড়া করতে নেমে ৬১-টি টি-২০ ম্যাচের মধ্যে ৪১-টিতেই জিতেছে ভারত। এর আগে ৬৯-টি ম্যাচের মধ্যে ৪০-টিতে জয় পেয়ে অস্ট্রেলিয়া ছিল দ্বিতীয় স্থানে। ৬৭-টি ম্যাচের মধ্যে ৩৬-টিতে জিতে পাকিস্তান রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

নাগপুরে চাহারের হ্যাটট্রিক, সিরিজ জয় : ৩.২ ওভারে সাত রান দিয়ে ছয় উইকেট। তার মধ্যে আবার রয়েছে হ্যাটট্রিক। গত ১০ নভেম্বরের নাগপুর টি-২০ যেন লেখা হয় থাকল দীপক চাহারের নামে। তিনি হ্যাটট্রিক করেন বাংলাদেশের শাফিউল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান ও আমিনুল ইসলামকে ফিরিয়ে। ১৮তম ওভারের শেষ বলে শাফিউল আর ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে মুস্তাফিজুর ও আমিনুলকে ফেরান তিনি। একইসঙ্গে ৩০ রানে জেতান দলকে। যা এনে দেয় সিরিজও। সার্বিকভাবে টি-২০-তে দীপক চাহারের সাত রানে ছয় উইকেট চতুর্থ সেরা। সার্বিকভাবে টি-২০ ফরম্যাট মানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়াও আইপিএল-সহ বিভিন্ন দেশে হওয়া টি-২০ লিগ ও ঘরোয়া টি-২০ ম্যাচকে ধরা হচ্ছে। এর আগে মাত্র একজন ভারতীয়, একতা বিস্ত টি-২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। তবে তা ছিল মহিলাদের ক্রিকেটে। পুরুষদের ফরম্যাটে দীপকই প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-২০ আন্তর্জাতিকে হ্যাটট্রিক করলেন। সব মিলিয়ে টি-২০ আন্তর্জাতিকে দ্বাদশ বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন তিনি।

২০১৯ সালে এটা আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ষষ্ঠ হ্যাটট্রিক। এই বছর পুরুষদের ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ভারতের হয়ে এটা তৃতীয় হ্যাটট্রিক। এর আগে একদিনের ফরম্যাটে মহম্মদ শামি ও টেস্টে জশপ্রীত বুমরা হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

এর আগে এই ফরম্যাটে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড ছিল শ্রীলঙ্কার অজন্তা মেন্ডিসের। ২০১২ সালে হামবানটোটায় জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আট রানে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন এই রহস্য-স্পিনার। চাহার টপকে গেলেন তাকে। এই ফরম্যাটে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড এখন তার দখলে। এই তালিকায় দুই ও তিন নম্বরে রয়েছেন অজন্তা মেন্ডিস। ২০১১ সালে পাল্লেকেলেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ রানে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আর তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন আরও এক ভারতীয়। লেগস্পিনার যুজবেন্দ্র চহাল ২০১৭ সালে বেঙ্গালুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৫ রানে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন।

টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন অফস্পিনার হরভজন সিং। ২০০১ সালে ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রিকি পন্টিং, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ও শেন ওয়ার্নকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করাচি টেস্টে ইরফান পাঠান পর পর ফিরিয়েছিলেন সলমন বাট, ইউনিস খান ও মহম্মদ ইউসুফকে। আর কয়েক মাস আগে কিংস্টন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ড্যারেন ব্রাভো, শামারহ ব্রুকস ও রস্টন চেজকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেন বুমরা। আর একদিনের ফরম্যাটে চেতন শর্মা, কপিল দেব ও কুলদীপ যাদব হ্যাটট্রিক করেছেন ভারতের হয়ে। ১৯৮৭ সালে প্রথম ও তরুণতম ভারতীয় হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছিলেন চেতন শর্মা। নাগপুরে রিলায়্যান্স বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের কেন রাদারফোর্ড, ইয়ান স্মিথ ও চ্যাটফিল্ড— তিনজনকেই পর পর বোল্ড করেছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কপিলদেব পর পর ফিরিয়েছিলেন রোশন মহানামা, রুমেশ রত্নায়েকে ও সনৎ জয়সূর্যকে। আর কুলদীপ যাদব ২০১৭ সালে ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু ওয়েড, অ্যাশটন আগার ও প্যাট কামিংসকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি।

এদিন ১.১৬ গড়ে ছয় উইকেট নিয়েছেন দীপক চাহার। যা কোনও টেস্ট খেলিয়ে দেশের বোলারের পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়া স্পেলে সেরার তালিকায় তিন নম্বরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে ১০.২ ওভারে ৫৬ রানের বিনিময়ে আট উইকেট নিয়েছেন দীপক চাহার। গড় মাত্র ৭। যা তিন বা তার বেশি ম্যাচের সিরিজে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সেরা। ২০১৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ৩.৮৮ গড় হল ভারতের সেরা।

এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতটি টি-২০ খেলেছেন দীপক চাহার। তার মধ্যে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন দু'বার। তুলনায় ৪২-টি টি-২০-তে মাত্র দু'বার ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন জশপ্রীত বুমরা। গত বছর ব্রিস্টলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০-তে অভিষেক হয়েছিল দীপকের। সেই ম্যাচে চার ওভারে ৪৩ রান দিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন এক উইকেট। তার পর থেকে ছয় ম্যাচে ৭.৪০ গড়ে ও মাত্র ৪.৭৭ ইকনমি রেটে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিনের টি-২০-তে ভারতীয় পেসাররা নয় উইকেট নিয়েছেন। যা টি-২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় পেসারদের সবচেয়ে বেশি সাফল্য। এর আগেও একবার কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে ভারতীয় পেসাররা নয় উইকেট নিয়েছিলেন। যা হয়েছিল ২০০৭ সালে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

টেস্ট সিরিজ :

তিন দিনেই ইন্দোর টেস্ট ইনিংস ও ১৩০ রানে জিতল ভারত, দ্রুততম ২৫০ উইকেট অশ্বিনের : ভারতের তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মুকুটে নতুন পালক। ঘরের মাঠে টেস্টে দ্রুততম ২৫০ উইকেটের মালিক হলেন তিনি। গত ১৪ নভেম্বর ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ অধিনায়ক মোমিনুল হককে বোল্ড করে নতুন কীর্তি গড়লেন অশ্বিন। ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ভারতের পেসাররা শুরু থেকেই নজর কাড়েন। মোমিনুলকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের মাঠে দ্রুততম ২৫০ উইকটে সংগ্রহ করেন অশ্বিন। ৪২-টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ২৫০ উইকেট নেন তিনি। এই নজির গড়ে দেশের প্রাক্তন তারকা স্পিনার অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিং-এর সঙ্গেও একই আসনে বসে পড়লেন অশ্বিন। ঘরের মাঠে কুম্বলে ৪৩-টি ম্যাচ থেকে ২৫০ উইকেট নিয়েছিলেন। একই মাইলস্টোনে পৌঁছতে ভাজ্জি নেন ৫১-টি টেস্ট ম্যাচ। অশ্বিন অবশ্য অগ্রজদের থেকে একটু তাড়াতাড়িই ২৫০ উইকেট নেন। টেস্টে তার শিকার সংখ্যা ৩৫৯। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরণও ৪২-টি ম্যাচ থেকে ২৫০-টি উইকেট নিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত মুরলীই ছিলেন দ্রুততম ২৫০ উইকেট শিকারী। ইন্দোরে মুরলীকে ছুঁয়ে ফেলেন অশ্বিন। প্রায় বছর দেড়েক পরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটে অশ্বিনের। ক্যারিবিয়ান সফরে দলের সঙ্গে গেলেও একটি ম্যাচেও নামেননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১৫-টি উইকেট নেন অশ্বিন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পুরনো ছন্দের ঝলকানি অশ্বিনের বোলিংয়ে। প্রসঙ্গত, তিন দিনেই প্রথম টেস্ট জিতল ভারত। গত ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোরে জয় এল ইনিংস ও ১৩০ রানে। দুই দিন বাকি থাকতেই সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল বিরাট কোহালির দল। পরের টেস্ট ইডেনে ২২ নভেম্বর থেকে। দিন-রাতের সেই টেস্ট গোলাপি বলে হয়।

ইডেনে গোলাপি বলের টেস্ট ইনিংস ও ৪৬ রানে জিতল ভারত, উমেশের পাঁচ উইকেট : ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে ৩০.৩ ওভারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস। মাত্র ১০৬ তুলেছিল তারা। জবাবে বিরাট কোহালির অনবদ্য সেঞ্চুরির সুবাদে নয় উইকেটে ৩৪৭ রানে ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষণা করে ভারত। লিড ছিল ২৪১ রানের। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রথম ওভার থেকে চাপে পড়ে বাংলাদেশ। গত ২৪ নভেম্বর ১৯৫ রানে শেষ হল বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস। এদিনের খেলার সময় ৪৫ মিনিটের মধ্যেই গোলাপি বলের টেস্ট ইনিংস ও ৪৬ রানে জিতল ভারত। দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ ফলে পকেটে পুরল বিরাট কোহালির দল।

আড়াই দিনেরও কম সময়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় হাসিল করে নিয়েছে বিরাটবাহিনী। তা দেখতে শেষ দিন পর্যন্ত গ্যালারি ভরিয়ে রেখেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই জয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই খেলায় একাধিক নজির গড়ে ফেলেছে ভারত। একইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৬০ পয়েন্টে আরও এগিয়ে গেল তারা। অধিনায়ক কোহালির টানা সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়, ভারতীয় পেসারদের উইকেট নেওয়া থেকে শুরু করে স্পিনারদের শূন্য-ঝুলি, এমন একাধিক নজির গড়ে ফেলেছে ভারত। পর পর সাতটি টেস্ট জিতে বিরাট কোহালির নেতৃত্বে টানা সবচেয়ে বেশি টেস্ট জিতল ভারত। ভাঙল

২০১৩ সালে ধোনির রেকর্ড। ধোনির অধিনায়কত্বে টানা ছ'টি টেস্ট জেতার রেকর্ড ছিল ভারতের। ধোনির অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর ৪-টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিদের বিরুদ্ধে দু'টি জয় ছিল ভারতের। কোহালির অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় হাসিল করল ভারত।

শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আরও একটি নজির গড়ল ভারত। ঘরের মাঠে টানা ১২ নম্বর টেস্ট সিরিজ জয়ের নজিরও গড়ে ফেলল তারা। রেকর্ড করেছেন ভারতীয় বোলাররাও। ঘরের মাঠে টেস্টে এই প্রথম বিপক্ষের ১৯-টি উইকেট নিলেন ভারতীয় পেসাররা। আগে রেকর্ড ছিল ১৭ উইকেট নেওয়ার। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৭-টি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ছিল ভারতীয় পেসারদের। এতদিন যতগুলো টেস্ট খেলেছে ভারত, তাতে স্পিনাররা প্রতি টেস্টেই উইকেট পেয়েছেন। কিন্তু ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজই প্রথম, সেখানে স্পিনারদের ঝুলি ফাঁকা থেকে গিয়েছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই টেস্ট সিরিজে দু'টি টেস্টই ইনিংসে জিতে নেয় ভারত। তার ঠিক আগে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দু'টি টেস্টেই ইনিংসে জয়ী হয়েছিল ভারত। ফলে টেস্টের ইতিহাসে ভারতই প্রথম দল, যারা ইনিংসে টানা চারটি টেস্ট জিতে নেয়। একই টেস্টে প্রথম দু'জন ভারতীয় পেসার আটবার তার বেশি উইকেট দখল করলেন। ইশান্ত শর্মা ন'টি এবং উমেশ যাদব ৮-টি উইকেট দখল করেছেন। এমন নজিরও প্রথম। আরও নজির গড়ল ভারত, ভারত বনাম বাংলাদেশ সিরিজে ভারতের পেসারদের বোলিং গড় ১৩.৮৪; ঘরের মাঠে দু'টি বা তার বেশি টেস্টের সিরিজের ক্ষেত্রে যা সেরা। চলতি বছরে ভারতীয় পেসারেরা ৯৫-টি উইকেট নিয়েছেন ১৫.১৬ গড় ও ৩১.০৬ স্ট্রাইক রেটে। এই স্ট্রাইক রেট এক ক্যালেন্ডার বর্ষে ৫৯ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে সেরা। পাশাপাশি প্রথমবার উমেশ, ইশান্ত এবং শামি এই তিন ভারতীয় পেসার এবছর ২০ বা তার বেশি উইকেট নিলেন কুড়ির কম গড়ে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ 'গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে বছরে ভারতে প্রায় ১.৯৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যুর পিছনে কারণ ছিল বায়ুদূষণ। অর্থাৎ গড়ে প্রতি দিন প্রায় ৫৩৫ জন শিশুর জীবন কেড়ে নিচ্ছে দূষিত বাতাস। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত তিন দশকে বায়ুদূষণের কারণে এক কোটির বেশি শিশু পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা গিয়েছে। দীর্ঘ সময় দূষিত বায়ুতে থাকলে শিশু দেহে মারাত্মক প্রভাব হয়। এধরনের শিশুদের বয়সের তুলনায় ফুসফুস সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে না। একটু বড়ো হলে এদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। যাদের জন্মগত হাঁপানির সমস্যা রয়েছে তাদের চিত্রটি আরও খারাপ। চিকিৎসকদের মতে, ধূমপানে কোনও ব্যক্তির ফুসফুসে যতটা ক্ষতি হয়, বায়ুদূষণের কারণে প্রভাবিত মানুষের ফুসফুসের অবস্থাও প্রায় ততটাই খারাপ।

● **হলদিয়া পাচ্ছে গ্রিন পোর্টের তকমা :**

হলদিয়া বন্দরের মুকুটে জুড়তে চলেছে নতুন পালক। দূষণের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে গ্রিন পোর্টের তকমা পেতে চলেছে তা। যার দৌলতে নতুন করে অক্সিজেন পাবে হলদিয়া শিল্পশহর। কলকাতা বন্দর সূত্রের খবর, স্বচ্ছ ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে দেশজুড়ে গ্রিন পোর্ট বানানোর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র সরকার। তারই অঙ্গ হিসেবে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রিন পোর্টের তকমা পেতে চলেছে হলদিয়া।

প্রয়াণ

● **টি. এন. শেষণ :**

মারা গেলেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেষণ। বয়স হয়েছিল ৮৬। গত ১০ নভেম্বর চেন্নাইয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস. ওয়াই. কুরেশি ট্যুইট করে শেষণের মৃত্যুর খবর দেন। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেরলেন পলাক্কড় জেলার তিরুনেল্লাইয়ে জন্ম তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষণের। পদার্থবিদ্যার স্নাতক শেষণ এক সময়ে কাজ করতেন মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে। ১৯৫৫ সালে যোগ দেন সিভিল সার্ভিসে। পরে এডওয়ার্ড ম্যাসন ফেলোশিপ পেয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন প্রশাসন সম্পর্কে। প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য পেয়েছিলেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার আগে ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন শেষণ। কিন্তু স্মরণীয় হয়ে আছে ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তার কার্যকালই। সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা, ভোটে টাকা ছড়ানো বন্ধের মতো পদক্ষেপ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এনেছিলেন শেষণ। পরে পা রেখেছিলেন রাজনীতিতেও। লালকৃষ্ণ আডবাণীর বিরুদ্ধে গান্ধীনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সেযাত্রায় হার মানতে হয়েছিল তাকে।

● **ক্ষিতি গোস্বামী :**

স্বরযন্ত্রের সমস্যার চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন চেন্নাইয়ে। সেখানেই গত ২৪ নভেম্বর একটি বেসরকারি হাসপাতালে অকস্মাৎ প্রয়াণ ঘটল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং আরএসপি-র সাধারণ সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামীর (৭৬)। বাম জমানার পূর্তমন্ত্রীর মরদেহ দান করা হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

● **নবনীতা দেবসেন :**

প্রয়াত নবনীতা দেবসেন। কবি, সাহিত্যিক, লেখক, প্রাবন্ধিক। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত ৭ নভেম্বর নিজের কলকাতার বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন নবনীতা। তার মধ্যেও নিয়মিত লেখালেখি করে গিয়েছেন। পদ্মশ্রী, সাহিত্য অ্যাকাডেমি-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার জয়ী নবনীতার জন্ম কলকাতায়। তিনি রাধারানি দেবী ও নরেন্দ্রনাথ দেবের কন্যা। বাবা ও মা দু'জনেই কবি, নবনীতাও আজীবন কাব্যচর্চা করে গিয়েছেন। কবিতা ও গদ্য, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত। এছাড়া ভ্রমণকাহিনী রচনাতেও তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। তিনি দীর্ঘ দিন 'রামকথা' নিয়ে কাজ করছেন। সীতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি রামকথার বিশ্লেষণ করেছেন। 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ' তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

December, 2019
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, কে. শ্যামা প্রসাদ কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।